
প্রতিদিন
২৪ জানুয়ারি ২০১০
অপরাজিত আনন্দ
রবিবার
সংবাদ প্রতিদিন-এর সঙ্গে বিনামূল্যে



পত্রিকাটি ধুলো খেলায় প্রকাশের জন্য

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরোনো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই-মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail : optifmcvbertron@gmail.com


অঞ্জলি জুয়েলার্স
সবার জন্য
Mayurakshi/289/10
গোলপার্ক - ২৪৬০ ০৫৮১/২৪৪০ ১৭৯২ | শোভাবাজার - ২৫৩৩ ৫৮৩২/৩৪
সল্টলেক বি.ই. - ২৩২১ ২০৫৭/২৭৮৬ | সল্টলেক এইচ.এ. - ২৩২১ ৮৩১০/১১
বেহালা - ২৪৪৫ ৫৭৮৪/৮৫ | হাওড়া পঞ্চাননতলা - ২৬৪২ ৪৬৪০/৪১ | বারাসাত - ২৫৮৪ ৭১৩৯/৪২
এছাড়া আমাদের আর কোনো শাখা নেই। দোকান রাত ৮.০০ পর্যন্ত খোলা।
উপহার কেনা আর সময়সাপেক্ষ নয়।
Gifty
GIFT VOUCHER
যেকোনো মূল্যের পাওয়া যায়। সবরকম গয়নার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।
যোগাযোগ করুন স্টোর ম্যানেজারের সঙ্গে।
জুয়েলারী ইনসেন্টিভ স্কীমে
মাসে মাসে ১০০, ২৫০, ৫০০, ১০০০ টাকা
বা তার বেশীর কিস্তিতে ধাপে ধাপে টাকা জমান।
১২ মাস টাকা জমালে
১ মাস ফ্রি !!
www.anjali.bz
* শর্তাবলী প্রযোজ্য।

২৪ জানুয়ারি ২০১০

সংবাদ প্রতিদিন

রোববার

প্রচ্ছদ : তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

সৌজন্য : নীতি নন্দী

টিম রোববার

তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, নীলাঞ্জনা বসু, প্রসূন চক্রবর্তী, বর্ণিনী মৈত্র চক্রবর্তী, বিপুল গুহ, ভাস্কর লেট, রিংকা চক্রবর্তী রাজু সরদার, শান্তনু দে, সন্তোষ দত্ত, সুপ্রিয় দাস

সম্পাদক ঋতুপর্ণ ঘোষ
সহযোগী সম্পাদক অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায়

প্রতিদিন প্রকাশনী লিমিটেডের পক্ষে সৃঞ্জয় বোস কর্তৃক বি এল পাব্লিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত এবং প্রকাশিত।

সংবাদ প্রতিদিন-এর সঙ্গে বিনামূল্যে

ফার্স্ট পার্সন ঋতুপর্ণ ঘোষ

আমাদের জেনারেশন-এর সব ছেলেমেয়েরাই মতি নন্দীকে চিনতে শিখেছিল বোধহয় তাঁর শারদীয় আনন্দমেলা-র উপন্যাসগুলো দিয়ে।

আমাদের জেনারেশন-এর সব ছেলেমেয়েরাই মতি নন্দীকে চিনতে শিখেছিল বোধহয় তাঁর শারদীয় আনন্দমেলা-র উপন্যাসগুলো দিয়ে।

প্রোফেসর শঙ্কু এবং কাকাবাবু-র যেমন একটা নির্দিষ্ট মোড়ক ছিল, তারই মধ্যে ঘোরাফেরা করত নানা অ্যাডভেঞ্চার-কাহিনি, নতুন নতুন রহস্য-গল্প—মতি নন্দীর লেখাগুলোও কোনও একটা ভীষণ জীবন্ত আবেগের নানারকম চেহারা। সেই বয়সে সেই আবেগটা দুরন্তভাবে তীব্র, এবং তার আকর্ষণ প্রায় অপ্রতিরোধ্য। আবেগটার নাম তখন জানতাম, খেলা। পরে, আরেকটু বড় হয়ে বুঝেছি—সেটা আসলে ভেতরের লড়াই।

আমি যে আমি, খেলার ধার মাড়াই না কোনওদিন, খবরের কাগজের খেলার পাতা অবলীলায় উল্টে চলে যাই; আমিও আনন্দমেলা-র ওই উপন্যাসগুলোর পাতায় কখন যে আটকে যেতাম জানি না। আমার অনেক বন্ধুর কাছেই যেটা ছিল একটা চেনা জগৎ, আমার কাছে কখন যে সেটা হয়ে উঠেছে এক অচেনা আনন্দর প্রবেশদ্বার! যে-দরজা খুলে আমি অত্যন্ত সহজে বিচরণ করতে পারছি প্রতিটি লড়াকু মনের আঘাত, হতাশা, উঠে দাঁড়ানো, এগিয়ে যাওয়ার দর্শক হয়ে।

খেলা সম্পর্কে যেমন শুনি—'খেলাটাই আসল, জেতা হারা তার অনেক পরে'; মতি নন্দীর চরিত্রগুলো সেই ছোট ছোট 'জেতাহারা'-গুলোকে তুচ্ছ করে দিয়ে কখন যে মনটাকে নিয়ে যেত এক বিরাট জয়ের আঙিনায়—সেটা মনেও পড়ে না।

সেদিন কোনও একটা কাগজে, বা রেডিওতে আলোচনা পড়ছিলাম বা শুনছিলাম, বাংলা সিনেমার বহুলবিখ্যাত সংলাপাংশ কী কী! বেশির ভাগই চেনা এবং অত্যন্ত সুপরিচিত। তার মধ্যে একটা সংলাপ খুঁজে পেলাম না। আমার খুব প্রিয় সংলাপ, মনে করিয়ে দিলে অনেকেরই মনে পড়বে।

'কোনি' বলে মতি নন্দীর উপন্যাসাশ্রিত একটা ছবি হয়েছিল। সেখানে ক্ষিদ্দা-বেশী সৌমিত্রদার সেই অমোঘ আহ্বানবাণী—ফাইট কোনি, ফাইট।

২

তারপর বহু বছর কেটে গিয়েছে। আমি শারদীয় আনন্দমেলা-র বয়স ছাড়িয়েছি। তখন ছবি বানানো শুরু।

'উনিশে এপ্রিল' হয়ে গিয়েছে। এবার নতুন কোনও ছবি। নতুন কোনও বিষয়।

'উনিশে এপ্রিল' করে আমার ঘরকুনো সিনেমা-করিয়ে বলে বদনামও হয়েছে। ফলে বিষয়টা আউটডোর-ভিত্তিক হলে ভাল হয় ইত্যাদি প্রভৃতি ভেবে নানা গল্প নতুন করে পড়ছি।

এমন সময় প্রথম পড়লাম, মতি নন্দীর 'একটি পিকনিকের অপমৃত্যু'।

কথাবার্তা হয়ে গেল। মতি নন্দীর সঙ্গে যোগাযোগ হল। মতি নন্দী মতিদা হলেন। কিন্তু ছবির নায়ক পাওয়া গেল না। এমনই এক খর্বকায়, বামনাকৃতি, অপাংক্তেয় নায়ক যে সাবলীল দক্ষতায় নারকেল গাছ চড়তে পারে।

ছবির নায়ক পেলাম না। বাকি ছেলেমেয়েগুলো জোগাড় করা শক্ত হত না হয়তো। একটি 'পিকনিকের অপমৃত্যু' করা হল না, আমার।

হল সুচিত্রাদির উপন্যাস নিয়ে 'দহন'।

কিন্তু মতিদার ছোটগল্পটা মাথার মধ্যে এখনও ঘুরপাক খায়।

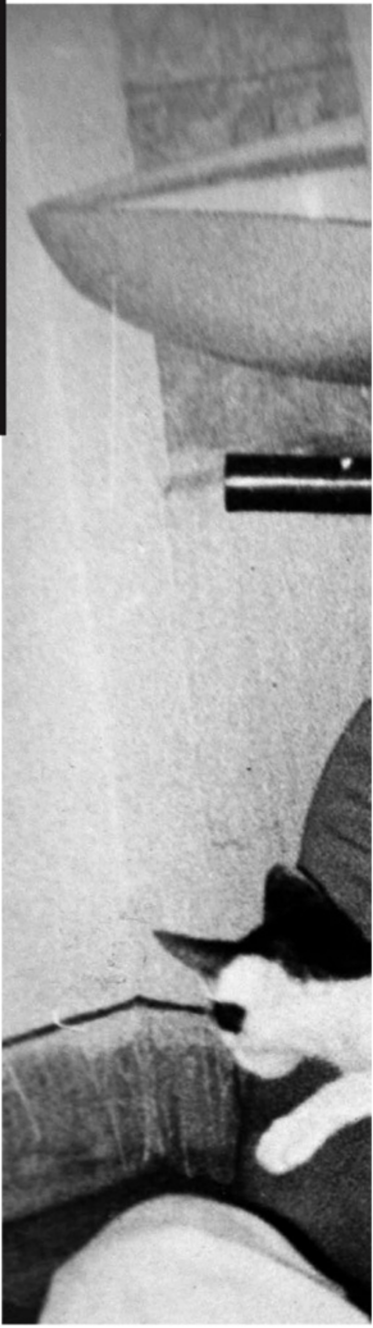
ততদিনে মতিদার শরীর খারাপ, প্রায় গৃহবন্দি। স্ট্রাইকার, স্টপার, অপরাজিত আনন্দ-র আবহমান উদ্যম ধীরে ধীরে ক্ষীণ ক্লান্ত হয়ে আসছে। প্রায় মতিদার শেষ নায়িকা বিজলীবালা-র মতোই শয্যাগত।

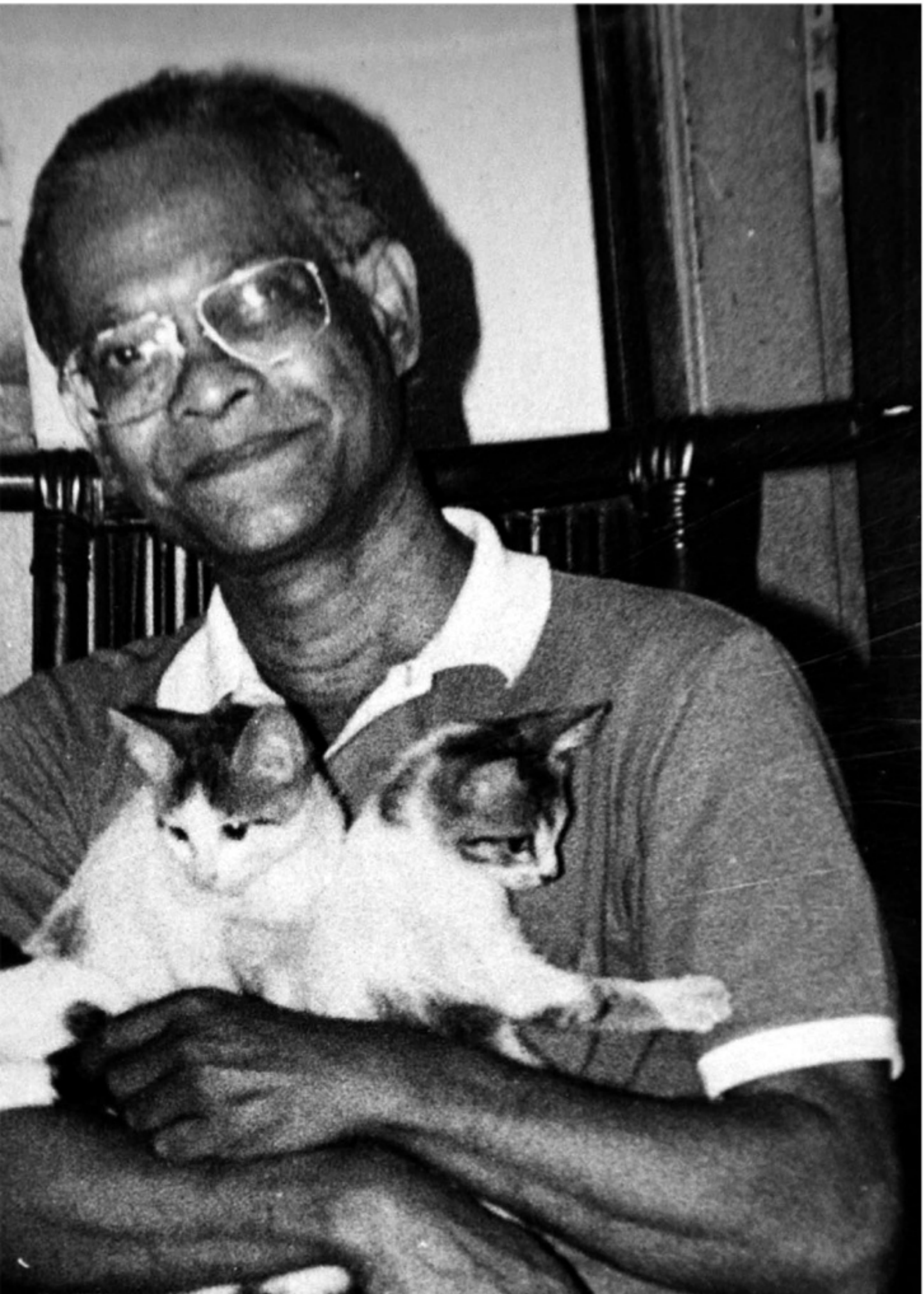
তারপর এই শীতে, সারা শহর যখন বনভোজনে মেতে ওঠে, কখন যেন লড়াই করার উঁচুতে ওঠার নারকেল গাছের ডালটা ফসকে মতিদা চলে গেলেন।

আমাদের আশৈশব বনভোজনের মাঝখান থেকে। তাঁর সেই অমোঘ উচ্চারণ Top ten chart-এ উঠল না।

নিভৃত রয়ে গেল আমাদের মনের ভেতর। আজীবন।

—ফাইট কোনি, ফাইট।







পরিচয়, ভাল লাগা বইটির সঙ্গে

আপনার বাড়িতে আজ পার্টি। আপনার স্ত্রীর বিশেষ উদ্যোগে। তিনিই করেছেন নেমন্তন্ন। সন্ধে হয়ে এল। কলিংবেলের শব্দ। পার্টির প্রথম অতিথি দরজায়। আর আপনি এইমাত্র জেনেছেন, আপনার স্ত্রী আপনাকে ছেড়ে চলে গিয়েছেন। আপনি জানেন না কোথায়। ঢুকলেন জুলি-পিসি। এসেই জিগ্যেস করলেন, তোর বউ কোথায় রে? আপনি চটজলদি মিথ্যে বললেন, বুড়ি কাকির সেবা করতে গিয়েছে। হঠাৎ খবর এল, কাকি অসুস্থ। কাকি! তোর বউয়ের কোনও কাকি আছে বলে তো জানতাম না! কাকিটি থাকেন কোথায়? জুলি-পিসির পাল্টা প্রশ্ন। আপনি আবার মিথ্যে বললেন, কাসুন্দিপুরে। কাসুন্দিপুরের কাকি! জুলি-পিসির কণ্ঠে ঈষৎ অবিশ্বাস যেন!

আপনার অবস্থা টি এস এলিয়ট-এর 'দ্য ককটেল পার্টি' কাব্যনাট্যের এডওয়ার্ড চেম্বারলেন-এর মতো। তারও বাড়িতে আজ পার্টি। তার স্ত্রী ল্যাভিনিয়া-র বিশেষ উদ্যোগে। এবং এডওয়ার্ড এইমাত্র জেনেছে, স্ত্রী-টি পালিয়েছে। 'দ্য ককটেল পার্টি'-র শুরুতেই জমজমাট গল্প। 'দ্য ককটেল পার্টি'—এরকম রঙিন নামের কাব্যনাট্য কি না-পড়ে উপায় আছে? এলিয়ট লিখেছিলেন ১৯৪৯-এ। আমি প্রথম পড়ি ছাত্রজীবনে, ষাটের দশকে। তারপর কতবার যে দূরপাল্লার ট্রেনে বা প্লেনে পড়েছি! এক, পড়েছি কাব্যনাট্যটির রুদ্ধশ্বাস গতির টানে। দুই, পড়েছি এলিয়ট-এর ভাষার টানে। সম্মোহিত হয়ে থাকতে হয় সারাক্ষণ। 'দ্য ককটেল পার্টি' আগাগোড়া কবিতায় লেখা। কিন্তু এত বিশুদ্ধ গদ্য! অথচ সূক্ষ্ম বুননে কবিতাও! যেমন, What we know of other people/Is only our memory of the moments/ During which we knew them. গদ্য? না, কবিতা? এলিয়ট মুছে দিয়েছেন বিভেদরেখা। তিন, পড়েছি অন্তহীনতার টানে। এ-নাটকের সবটাই লেখা চলতি সংলাপী ভাষায়। তরতর করে এগিয়ে চলে। কোথাও নেই অপরিচিত শব্দের হোঁচট। অথচ এই সহজতা সহজ নয়। অন্তহীন পরতে খুলতে থাকে নিহিত অর্থ। উন্মোচিত হয় নব-নব ব্যঞ্জনা। যতবার পড়েছি, ততবারই নতুন। শুধু পড়েছি। কখনও মঞ্চে দেখিনি। আমার দুর্ভাগ্য।

এডওয়ার্ড আর ল্যাভিনিয়া পাঁচ বছরের কর্তাগিন্নি। আরও পাঁচটা বিবাহিত জীবনের মতোই এদের জীবন। অসুখী। এডওয়ার্ড বিশ্বাস করে, ল্যাভিনিয়া এমন এক নারী, যাকে ভালবাসতে পারে না কেউ। ল্যাভিনিয়া বিশ্বাস করে, এডওয়ার্ড এমন এক পুরুষ, যে ভালবাসতে জানে না। এমন দু'টি নারী-পুরুষ সহবাস করে শুভবিবাহের সৌজন্যে। এবং পরস্পরের কাছে ওরা প্রতিদিন মরে : We die to each other daily. মরতে-মরতেও পরস্পরের সঙ্গে কথা বলে 'অপূর্ব' কবিতায়, যে-কবিতা বিপজ্জনকভাবে বেঁচে থাকে সারাক্ষণ মারক-গদ্যের একচুল দূরত্বে।

Lavinia : Oh, Edward!
The point is, that since I have been away
I see that I've taken you much too seriously
And now I can see how absurd you are.
Edward : That is a very serious conclusion
To have arrived at in...how many?...thirty-two hours.

পাঁচ বছরের বিবাহিত জীবনের অনেক কথাই, অনেক ঘটনাই ভুলতে চায় এডওয়ার্ড। তা-ই তো আমরা সবাই চাই। যা কিছু যন্ত্রণাময়, অপমানকর, ভুলতে চাই আমরা। কিন্তু ভোলা যে উচিত নয়। ভোলা মানে তো লুকনো, নিজেকে ঠকানো। আমাদের মনে রাখতে হবে সব কিছু, অথচ চর্চা করতে হবে নির্লিপ্তির। পৌঁছতে হবে সেই মানসবিন্দুতে যেখানে প্রত্যহের ঘটনাকেও মনে হবে দূরের, পরিচিতকে মনে হবে অজানা আগন্তুক : But you must not forget them./You must face them all, but meet them as strangers. এই নির্বেদ থেকে উঠে এসেছে 'দ্য ককটেল পার্টি'-র মতো বর্ণময় নাটক, যে-নাটকের শুরুতে এবং শেষে সুরার জাগৃতি, যে-নাটকের শেষ লাইন : আমি খুশি, অবশেষে শুরু হল পার্টি।

'দ্য ককটেল পার্টি'-র অন্তর্নিহিত বিষয়টি ঠিক কী? নিজেকে চেনা? হয়তো তা-ই। আমরা সবাই একাধিক সম্পর্কের মধ্য দিয়ে বহুস্তরে প্রবাহিত। তাই নিজেকে জানাটা সহজ নয়। তবু না জানলেই নয়, আমি কে? অন্যদের চোখে আমি কেমন? অন্যদের মাঝে আমি ঠিক কী বা কে? এই মুহূর্তেই বা আমি কে? কারণ প্রতি মুহূর্তই তো আমাদের বদলে দিয়ে যায় :

To what does this lead?
Really to finding out
What you really are. What you really feel
What you really are among other people.
Most of the time we take ourselves for granted.
As we have to, and live on a little knowledge,
About ourselves as we were. Who are you now?
You don't know any more than I do,
But rather less. You are nothing but a set
Of absolute responses.

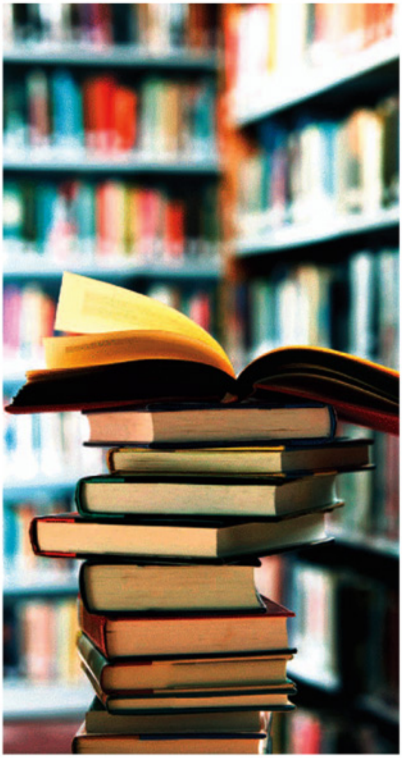
যতবার পড়েছি এই কাব্যনাটক, মনে-মনে চরিত্রদের তিন ভাগে ভাগ করে নিয়েছি। একদল অতি উচ্চমার্গের। যেমন স্যর হেনরি হারকোর্ট-রিলি, বিখ্যাত মনোবিদ। জুলিয়া এবং অ্যালেক্স, যারা অভিবাহকের মতো, অন্য চরিত্রদের চালায়। এদের তলার সারিতে এডওয়ার্ড চেম্বারলেন, ল্যাভিনিয়া আর পিটার। আর সিলিয়া একেবারে অন্য জাতের। নাটকের প্রথমে সে এডওয়ার্ডের প্রেমিকা। কিন্তু ক্রমশ তাকে নতুন আলোয় দেখতে পাই আমরা। নাটকের শুরুতে স্যর হেনরি অবিশ্যি নাম-না-জানা আগন্তুক, কিন্তু প্রথম থেকেই তিনি আমাদের নিয়ে যান নাটকের আন্তর-বিষয়ে : কোনও উদ্দেশ্য অবশ্যই নেই অন্ধকারে থাকার।

শুধু থেকো অন্ধকারে ততটুকু, যতক্ষণ না মন থেকে ঝরে যায় এই মোহ যে কখনও আলোয় ছিলে তুমি, There is certainly no purpose in remaining in the dark/Except long enough to clear from mind/The illusion of having ever been in light. এডওয়ার্ড-ল্যাভিনিয়া, পাঁচ বছরের স্বামী-স্ত্রী, মনে করে পরস্পরকে চেনে, কিন্তু চেনে না। সহবাস করে পারস্পরিক অন্ধকারে। এবং ক্রমশ বুঝতে পারে পারস্পরিক আলোয় ছিল না তারা কোনওদিন। ল্যাভিনিয়া চলে যায় এডওয়ার্ড-কে ছেড়ে। এডওয়ার্ড বউকে ভালভাবে মনে আনতেও পারে না। অসম্ভব তার পক্ষে হারানো-বউয়ের বর্ণনা দেওয়া। অথচ সে চায় বউ ফিরে আসুক :

I no longer remember what my wife is like.
I am not quite sure that I could describe her
If I had to ask for police to search for her.
I'm sure I don't know what she was wearing
When I saw her last. And yet I want her back.
And I must get her back, to find out what has happend
During the five years that we've been married.

ল্যাভিনিয়া-কে ফিরে পাওয়াটা শর্তহীন হয় না। স্যর হেনরি ল্যাভিনিয়া-কে ফিরিয়ে আনতে পারেন, কিন্তু এডওয়ার্ড তাকে প্রশ্ন করতে পারবে না, সে কোথায় ছিল, But if I bring her back it must be on one condition : That you promise to ask her no questions/Of Where she has been. এর পরেই শুরু হয় অন্য খেলা। অপরিচিত অপ্রত্যাশিত এক শক্তি যেন ভাসিয়ে নিয়ে যায় চরিত্রগুলিকে। যে-শক্তির ওপর কারও কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই। স্যর হেনরি আগেই বলেছিলেন এমনটাই ঘটতে চলেছে : But let me tell you, that to approach the stranger/Is to invite the unexpected, release a new force,/Or let the genie out of the bottle.

It is to start a train of events
Beyond your control.



জুলিয়ার নেপথ্য প্ররোচনায়, স্যর হেনরির প্রত্যক্ষ প্রণোদনায় আকস্মিক মোড় নিল কাহিনি, শুরু হয়ে গেল ঘটনার সারি, নিয়ন্ত্রণের অতীত। প্রতিটি চরিত্র বেছে নিতে বাধ্য হচ্ছে তার নিজের পথ। যে-পথ থেকে আর ফিরে আসার উপায় নেই। প্রতিটি জীবনেই আসে এই চূড়ান্ত 'চয়েস'-এর মুহূর্ত। এবং সেই মুহূর্তেই নির্ধারিত হয়ে যায় তার জীবনের রূপ, এমনকী মৃত্যুর চরিত্রও, যেমন সিলিয়ার মৃত্যু। সাজানো-গোছানো জীবন বলেও কিছু নেই। আচমকা ধাক্কা থাকবেই জীবনে, মনে করিয়ে দেবে এক অনিয়ন্ত্রিত শক্তির নির্দেশে চলেছি আমরা। ধরা যাক কোনও পার্টিতে যাচ্ছেন। সেজেগুজে পরিপাটি। বিশেষ ভূমিকার জন্য তৈরি আপনি। আপনার চারপাশের সব কিছু সমর্থন করছে আপনার বেছে-নেওয়া ভূমিকাকে। আপনি নামছেন সিঁড়ি দিয়ে। হয়তো একেবারে শেষ ধাপে। মনে করলেন এইখানেই বুঝি সিঁড়ি শেষ। কিন্তু আরও একটি ধাপ আছে, আপনার পা যা আশা করেনি, There is one step more than your feet expected/And you come down with a jolt. এলোমেলো হয়ে যায় পারিপাট্য। এমন অনিবার্য আকস্মিকের জন্যই প্রতি মুহূর্তে জীবন টাটকা নতুন : every moment is a fresh beginning.

এডওয়ার্ড-ল্যাভিনিয়া, পিটার-সিলিয়া, প্রত্যেকেই বেছে নেয় তাদের নিজস্ব জীবনপথ। এডওয়ার্ড-ল্যাভিনিয়া'র পক্ষে সম্ভব নয় তাদের মধ্যবিত্ততা পেরিয়ে সাধারণ চাওয়া-পাওয়ার বাইরে অন্য জীবনের স্বাদগ্রহণ। তারা নিজেদের সহ্য করতে শেখে। এবং তারা দেয় এবং পায় যেখানে যতটুকু দেওয়ার এবং পাওয়ার আছে। আর পিটার? I thought I had ideas to make a revolution/In the cinema, that no one could ignore–/And here I am, making a second-rate film. সব থেকে কঠিন কঠোর যন্ত্রণাময় 'চয়েস' সিলিয়ার। সেই কারণেই তার যন্ত্রণার নির্বাপণ ঘটে ক্রুশবিদ্ধ প্রাণার্পণে।

'দ্য ককটেল পার্টি'-র কোনও-কোনও পাঠকের কাছে পৌঁছতে পারে প্রাচীন গ্রিক নাট্যকার ইউরিপিডিস-এর প্রতিধ্বনি। সেটা একান্তই উপরি-পাওনা। 'দ্য ককটেল পার্টি'-র ইউরিপিডিস এতই প্রচ্ছন্ন যে তাঁর কথা না ভাবলেও চলে। তবু বলি, ইউরিপিডিস-এর 'অ্যালসেস্টিস' নাটকের নায়িকা অ্যালসেস্টিস-কে ভেঙে এলিয়ট তৈরি করেছেন তাঁর ল্যাভিনিয়া আর সিলিয়া-কে। অ্যালসেস্টিস স্বামী অ্যাডমিটাস-কে বাঁচাতে মৃত্যুবরণ করে। ল্যাভিনিয়া স্বামী এডওয়ার্ড-কে ছেড়ে চলে যায়। কিন্তু এডওয়ার্ড আর পিটারকে ছেড়ে সিলিয়া বেছে নেয় আত্মদানের পথ। স্যর হেনরি যেমন ফিরিয়ে আনেন ল্যাভিনিয়া-কে, তেমনি মৃত অ্যালসেস্টিস-কে ফিরিয়ে আনেন তাঁর স্বামীর কাছে হেরাক্লিস। ইউরিপিডিস-এর হেরাক্লিস-ই এলিয়ট-এর হেনরি। কিন্তু, আমার কাছে অন্তত, ইউরিপিডিস-এর অনুসৃতির চেয়ে অনেক বেশি জরুরি 'দ্য ককটেল পার্টি'-র আপাতত, বর্ণময়তা পেরিয়ে নিঃসঙ্গ অন্তরমহল : They make noises, and think they are talking to each other;/They make faces, and think they understand each other. প্রত্যেকেই নিজস্ব নিঃসঙ্গতার বৃত্তে। কেউ-কেউ সীতা-সিলিয়ার মতো নিয়তির হাত ধরে মুক্তি চায়।

গ্রানাদা থেকে মাদ্রিদ-৩

ট্রেনের কামরার সহোদরা

সময়মতো ট্রেনে উঠে নিজের জায়গায় বসেছি। সারাদিনের ক্লান্তি এতক্ষণে আমাকে চেপে ধরেছে। অসহ্য পা ব্যথা করছে। ঝোলা থেকে বেরুল আমার মলম, চটি খুলে, মোজা খুলে, আমি পায়ের শুশ্রূষার চেষ্টা শুরু করি। দু'টো পা-ই ফুলে উঠেছে হেঁটে হেঁটে। ভাগ্যিস জুতো পরিনি, জুতোতে পা ঢুকত না। যন্ত্রণায় প্রায় কান্না পাচ্ছে। আজ রাত্তিরের মতো ঘুমের দফারফা। গত রাত্রেও পা ব্যথা করেছিল কিন্তু এতটা বাড়াবাড়ি হয়নি। তবুও ঘুমের বেশ ব্যাঘাত হয়েছিল পায়ের কষ্টে। উৎসাহের চোটে সে কথা সারাদিন মনে পড়েনি। এটাই আমার অবিমৃষ্যকারী স্বভাবের গুণপনা!

সামনের সিটে তিনটি মেয়ে, আমার পাশেও দু'টি মেয়ে, সবাই ছেলেমানুষ, উনিশ-কুড়ির বেশি নয় কেউ। কিচিরমিচির করে ইতালিয়ান বলছে। ইতালিয়ান শুনতে ভারি মিষ্টি। ট বর্গের কোনও কঠিন ব্যঞ্জনবর্ণ নেই, শুধুই যেন নরম 'চ' 'ল' আর 'ত'-তে ভর্তি। আর সব শব্দই মিঠে স্বরান্তে শেষ হয়, 'ও', 'ই', 'এ', 'আ' দিয়ে। বাঙালি শ্রবণে মিষ্টি শোনাবেই। আমাদেরও 'চ' আর 'ত' অনেক, আর স্বরান্ত শব্দই বেশি। ইংরেজি আমাদের কানে একটু কাঠকাঠ শোনায়, সেই ভাষার ব্যঞ্জনান্ত শব্দেরা প্রায়শই হসন্তে শেষ হয় বলে। ইতালিয়ানে শব্দের ঝংকারটি আমাদের নিজের ভাষার মতনই শুনতে অনেকটা। স্প্যানিশ ততটা নয়। আমার দুই মেয়েই স্প্যানিশ পড়ত। স্বভাবতই, তাদের বাঙালি উচ্চারণের স্প্যানিশ বেশ মিষ্টি শোনাত তাদের মা জননীর কানে! সিডিতে শোনা নেরুদার নিজের কবিতা ও আবৃত্তির মাধুর্য তো তুলনাহীন। কিন্তু স্পেনের এই দক্ষিণ অঞ্চলে পথেঘাটে শোনা সাধারণ মানুষের স্প্যানিশ সেরকম শুনতে নয়। এখানে কণ্ঠনালীর পিছন দিক থেকে আরবি ধরণের 'খ' উচ্চারণের জন্য ভাষাটা মিঠে লাগে না আমার পশ্চিমবঙ্গীয় কানে, বরং মাঝে মাঝে বেশ রুক্ষই শোনায়। এই মেয়েদের ইতালিয়ান তাই আমার শ্রবণে বুঝি মধুস্রাবী। মেয়েগুলি দল বেঁধে বেড়াতে বেরিয়েছে মনে হয়। আমি ওদের কাছে অনুমতি চাই, সামনের সিটে একটু পা তুলতে পারি কি? সঙ্গে সঙ্গে তারা সরে গিয়ে জায়গা করে দেয়। আমি মনোযোগ দিয়ে শ্রীচরণের সেবা শুরু করি। ওদের ভাবভঙ্গি দেখে মনে হল যেন ওরা আমার পা বিষয়ে কিছু বলাবলি করছে। আমার বিরক্ত লাগল। পা ব্যথা বুঝি করে না লোকের? কী জানি, ওরা বোধহয় আমার পায়ের আঙুলের রুপোর আঙ্গোট নিয়ে কিছু বলছে। এ বস্তু দ্যাখে না তো।

ঠিক তাই। হঠাৎ একজন মেয়ে আমার পায়ের রুপোর আঙ্গোটটা আলতো স্পর্শ করে দেখল। দুই পায়েই আছে কি না, সেটাও চেক করল। কী রে বাবা? কী ভাবছে ওরা? তারপরে ইতালিয়ানে বলল, 'খুব সুন্দর'। আমি রিল্যাক্স করে যাই। যাক। ব্যাগ থেকে এবারে বের করেছি জল আর পেন-কিলার বড়ি। মালিশে কুলোচ্ছে না। হঠাৎ সামনের মেয়েটি আমার পা দু'খানা টেনে নিয়ে দুই হাতে চেপে ধরল। এবং আরেকজন একে একে আঙ্গোট দু'টো ফুলো পা থেকে মনোযোগ দিয়ে পটাপট খুলে নিল। আমি স্তম্ভিত। ওরা পাঁচজন, নিধিরাম একা। এবারে কি হাতের বালা, কানের মাকড়ি, গলার মঙ্গলসূত্র—? আমার মনের ভাষাও স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। এবার শুধু অপেক্ষা। ওরা কি আমাকে ট্রেন থেকে ফেলে দেবে?

এক মুহূর্ত মাত্র। খুলে নিয়ে আঙ্গোট দু'টো আবার মিষ্টি হেসে আমার হাতেই ফিরিয়ে দিল মেয়েটা। তারপরে একটি পায়ের পাতা নিজের উরুর উপরে টেনে নিয়ে খুব সুন্দর করে আমার পা



ম্যাসাজ করতে শুরু করে দিল। নিজেদের ব্যাগ থেকে অন্য একটি মলম বের করে লাগিয়ে দিল আমার পায়ে। অনেকক্ষণ ধরে অতি যত্নে পাকা হাতে ম্যাসাজ করা চলল। একে একে দুই পা-ই। সে যে কী আরাম, বলে বোঝানো সম্ভব নয়। করুণা ছাড়া আমি একে কী আখ্যা দেব? ভাঙা ফরাসি আর ভাঙা ইংরেজির কল্যাণে কথায় কথায় জানতে পারি ওরা এসেছে মিলানো থেকে, এক নার্সিং স্কুলের ছাত্রী। বিভিন্ন গ্রামের মেয়ে ওরা, কিন্তু পাঁচ বন্ধু একই বোর্ডিং-এ থাকে। এই প্রথম দেশের বাইরে বেড়াতে বেরিয়েছে, স্পেনের অনেক জায়গা ঘুরেছে একসঙ্গে, এখন ফিরে যাচ্ছে। ওই মেয়েটি ভাল ম্যাসাজ জানে, সে ফিজিওথেরাপি শেখে। এতে আমার আরাম হবে। সত্যি খুব আরাম হল, ঠিক যেন ভালো-বাসা বাড়ির সংসারের মাঝখানে আছি। আর কী-ই বা বেশি আদর, বেশি যত্ন পেতে পারতে তুমি নবনীতা, নিজের বাড়িতে এলে? (নির্লজ্জ নবনীতা বলে, আর কিছু না, শুধু ওই এক গামলা নুন দেওয়া গরম জল!) অচেনা অনাত্মীয়া এক বিদেশিনীর প্রতি মমতায় মেয়েগুলির ওই আন্তরিক সেবা সেই রাত্রে, সেই দূর দেশের ট্রেনের মধ্যে, সেই একাকী বেদনার মুহূর্তে ঈশ্বরের করুণা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। কতবার কতভাবে যে সৃষ্টিকর্তা তাঁর এই অযোগ্য সন্তানটিকে রক্ষা করেন, পালন পোষণ করেন! পথের মধ্যে কোথা থেকে জুটিয়ে দিলেন এমন সেবিকা? আস্তে আস্তে পায়ের যন্ত্রণা মনের আরামের নরম আস্তরণে ঢাকা পড়ে গেল। মানুষের সহানুভূতি, মানুষের মমতা, এর চেয়ে বড় জাদুমন্ত্র আর কী আছে জীবনে? ('মমত্ব' কথাটা কি সুন্দর, না? 'নিজের মতো'।) ইহজগতের সব যাতনার নিরাময় হয় হৃদয়ের স্পর্শে। গল্প করতে করতে এক সময়ে আমরা সবাই বসে বসেই স্বচ্ছন্দে ঘুমিয়ে পড়লুম। (আমাদের যে বসে বসে ভ্রমণের টিকিট!) সকালে ঘুম ভাঙল মাদ্রিদে।

'সুপ্রভাত'-এর পরে মেয়েরা প্রথমেই আমার পা নেড়েচেড়ে দেখল ব্যথার ও ফুলোর কী অবস্থা। অনেক ভাল। ব্যথা কম, ফুলো নেই। ইস্টিশানে আমাকে নিতে আসবেন ভারতীয় দূতাবাসের এক কর্মচারী। আমার লাইফস্টাইল এই শহরে কিঞ্চিৎ পাল্টাবে, এবারে রাষ্ট্রদূতের অতিথি কিনা। আর আমাকে ভাবতে হবে না পরের ধাপে কীভাবে কী করা। বর্তমান রাষ্ট্রদূত বাংলাভাষী, দার্জিলিং-এর বাসিন্দা, কলকাতায় পড়াশুনো। দয়াময়ী সহযাত্রিণীদের কাছে আমার বিদায় নেওয়ার লগ্ন এসে গিয়েছে। এইবারে মিলানো আর কলকাতার দু'টি পথ দু'টি দিকে যাবে। কিন্তু ভুলব না তোমাদের। কোনওদিন ভুলতে পারব না গ্রানাদা থেকে মাদ্রিদের যাত্রাপথে রাতের রেলগাড়ির কামরায় তোমাদের মায়াভরা স্নেহের স্পর্শ। গ্রানাদার ঝলমলে স্মৃতির সঙ্গে মিশে থাকবে মিলানের কয়েকটি নরম কচি মুখ। অনেক আদর করেছ তোমরা এই অপরিচিতাকে, অনেক প্রশ্রয় দিয়েছ। তোমাদের জীবনে ঠিক যেন এই আশীর্বাদটিই ফিরে ফিরে আসে সংবেদনের আশ্বাস নিয়ে, ঠিক এমন ভাবে, একাকিত্বের মুহূর্তে, যাতনার মুহূর্তে মানুষের অন্তরের উষ্ণতার, অযাচিত শুশ্রূষার কৃপাস্পর্শ নিয়ে। না চাইতেই আজ যা পেয়েছি, এর চেয়ে বেশি আর কী মিরাক্ল চাইতে পারে মানুষ?

আরিভেদিয়ের্চি। পুনর্দর্শনায় চ। (৮।৯।৯৪)

০৮.০১.২০১০

nabaneetadevsen@gmail.com

এবার মলাট ▲ জয় গোস্বামী

পাতালের স্বরলিপি

মানুষের ভেতর-উঠোনের অন্ধকার ধুলো ও কাঁকরগুলোকে আঙুলের টিপ দিয়ে দিয়ে তুলে এনে দেখান মতি নন্দী।

মতি নন্দীর বর্ণনা আমার ভেতর গেঁথে যায়। গেঁথে থরথর করতে থাকে যেভাবে নিক্ষিপ্ত ছুরি গন্তব্যে অব্যর্থ বিঁধে থরথর করে। শান্ত, একলক্ষ্য, নিশ্চিত—মতি নন্দীর বর্ণনা। সেই বর্ণনার মধ্যে দিয়ে এমন সব অবস্থার সঙ্গে আমি পরিচিত হই, যা আমাকে ছেড়ে যায় না আর। গল্প অথবা উপন্যাসটি পড়ার সময় যত ভেতরে ঢুকি, ততই সেই সব বর্ণনার অমোঘ প্রয়োজনীয়তা বুঝতে থাকি। কিন্তু, অনেক সময়ই এমন হয়, সে-লেখা পড়া হয়ে যাওয়ার পরও অনেকদিন, এই এক-একটি অংশ ভেতরে থেকে যায়, ক্ষতের মতো।

আমি স্মৃতির কাছে ফিরছি এখন। ঘুরে দেখছি। আর চোখের সামনে দিয়ে একের পর এক বর্ণনা মিছিল করে যাচ্ছে। তার মধ্যে হাত দিয়ে, যখন যা পাব, তুলে আনছি তা হলে।

> বাজার থেকে বেরিয়ে, ট্রামরাস্তা ধরে প্রবীর ষাট-সত্তর মিটার হেঁটেছে, তখনই ঘটল।
>
> তার সামনে, মাত্র দশ হাত দূরত্বে যে লোকটি ঠিক তার মতোই বাজারের থলি হাতে, সবুজ লুঙ্গি এবং সাদা পাঞ্জাবি পরে মাথাটা বাঁ ধারে হেলিয়ে হাঁটছিল তাকে আচমকা চারটি ছেলে প্রবীরের পিছন থেকে এগিয়ে এসে ঘিরে ধরল। প্রায় দু-হাত লম্বা মোটা একটা লোহার রড দিয়ে একজন লোকটির মাথার পিছনে মারল। ভোঁতা একটা শব্দ হল। মাথা ঘুরিয়ে লোকটি তাকাতেই প্রবীর ওর চোখে এমন এক ধরনের বিস্ময় দেখতে পেল যেটা তার একবছর বয়সী ছেলে বুবাই-এর চোখেই ফুটে ওঠে, হাত থেকে বিস্কুট বা খেলনা কেড়ে নিলে।
>
> লোকটির হাত থেকে থলিটা পড়ে গেল এবং দু'হাত বাড়িয়ে প্রবীরের দিকে তাকাল। রড হাতে ছেলেটি বিরক্ত-উত্তেজিত ভঙ্গিতে হাত নেড়ে প্রবীরকে বলল, 'হাঁটুন।' বুকফাটা একটা মরিয়া চিৎকার করে লোকটি প্রবীরের দিকে ছুটে আসতে গেল। চারজনের একজন ওর পাঞ্জাবি টেনে ধরে অতি দ্রুত পেটে ছুরি ঢুকিয়ে দিল। প্রবীরের হতভম্ব ভাবটা সঙ্গে সঙ্গে কেটে গেল এবং দেখল জায়গাটা ফাঁকা হয়ে গিয়েছে। তখন সে রাস্তার অন্যান্য লোকেদের মতো উর্ধ্বশ্বাসে ছুটল।
>
> কিছুদূর গিয়েই অবশ্য প্রবীর থেমে গেল। পিছনে তাকিয়ে দেখল লোকটি উপুড় হয়ে পড়ে। বাঁ হাতটা মুচড়ে বুকের নীচে, ডান হাতটা ট্রাফিক পুলিশের হাতের মতো প্রসারিত। বুবাই কখনও কখনও এইভাবে ঘুমায়। তখন সে সন্তর্পণে চিত করে দেয়।

এই বর্ণনা শান্ত নির্বিকার। কিন্তু, ভোঁতা একটা শব্দ হল। কত ভয়ঙ্কর একটি ঘটনার বর্ণনা, সমস্তটা দেখা যাচ্ছে, শোনা যাচ্ছে—কিন্তু এমন একটা ভাব—যেন, লেখক নয়, অন্য কেউ দেখছে। এর মধ্যে একটি অবিশ্বাস্য ব্যাপার আছে দু'টি জায়গায় : 'মাথা ঘুরিয়ে লোকটি তাকাতেই প্রবীর ওর চোখে এমন একটা বিস্ময় দেখতে পেল যেটা তার একবছর বয়সী ছেলে বুবাই-এর চোখেই ফুটে ওঠে, হাত থেকে বিস্কুট বা খেলনা কেড়ে নিলে।' এরই দ্বিতীয় প্রয়োগ, কয়েক নিঃশ্বাসের পরই পাব, লোকটি খুন হয়ে যাওয়ার পর। পাব, তার মৃতদেহের দিকে তাকিয়ে : 'লোকটি উপুড় হয়ে পড়ে। বা হাঁতটা মুচড়ে বুকের নীচে, ডানহাতটা ট্রাফিক পুলিশের মতো প্রসারিত। বুবাই কখনও কখনও এইভাবে ঘুমোয়। তখন সে সন্তর্পণে চিত করে দেয়।'

অভাবনীয় এই সাদৃশ্য কল্পনা। এবং আরও অভাবনীয়, ঠিক এর পরের লাইনটিই : 'বুবাই-এর জন্য বিস্কুট কেনার কথা মনে পড়ে যেতেই প্রবীর নিকটবর্তী দোকানটিতে ঢুকল।' অন্যপক্ষে এই মৃতদেহের ডান হাতের ভঙ্গির সঙ্গে ট্রাফিক পুলিশের হাতের তুলনায়, ব্যাপারটার ঠান্ডা কৌতুকে পুলিশ বা আইন রক্ষাকারীর উল্লেখও রইল। এই গল্পটি নিয়ে বিশদ কথা বলব না, মতি নন্দীর পাঠক মাত্রই অবহিত এ লেখাটি সম্পর্কে। এখানে 'তখন সে সন্তর্পণে চিত করে দেয়' কথাটি আসছে ঘুমন্ত শিশুসন্তানকে চিত করে দেওয়ার প্রসঙ্গে, এবং সদ্য খুন হওয়া একটি রক্তাপ্লুত মৃতদেহের অনুষঙ্গে। একটু পরে, পুলিশ এলে, নিশ্চয় ওই মৃত দেহটিকেও 'চিত করে' দেওয়া হবে। এটা ভেবেই পাঠকের বুক ছ্যাঁৎ করে ওঠে—যেমন, 'ভোঁতা একটা শব্দ' পড়ে শিউরে ওঠে পাঠক। এই যে চরিত্র, প্রবীর, এর মনটা কেমনভাবে চলাচল করে? উপুড় হয়ে পড়ে থাকা নিহতকে দেখে এক বুবাইয়ের ঘুমের ভঙ্গি মনে পড়ল—দুই, বুবাইকে মনে পড়তেই তার জন্য বিস্কুট কেনার কথা মনে পড়ে গেল—যা হয়তো এই ঘটনার চাপে ভুলে গিয়েছিল। এবং প্রবীর দোকানে ঢুকল বিস্কুট কিনতে। কীভাবে চলছে মনটা। পুরো ঘটনায় তার স্বাভাবিক গতি বিশেষ নাড়া খায়নি। পরে অবশ্য প্রবীর নামক চরিত্রটির এই নির্বিকার ভাব থাকে না। সে ওই খুনের দৃশ্যটির সাক্ষী থেকে গিয়েছে এই কথাটা যত জানাজানি হতে থাকে, তত সে ভয় পেতে থাকে সারাক্ষণ। ঘুমিয়ে পড়ার আগেও যেন নিজের শোওয়ার ঘরের দরজায় পর্দার নীচে কারও পা দেখতে থাকে। এই ভয়টা বরং আমার কাছে প্রত্যাশিত, কিন্তু একেবারেই সব আন্দাজের বাইরে প্রথম আঘাতের পর ওই সদ্য খুন হতে চলা লোকটির চোখের সঙ্গে এক বছরের বুবাইয়ের তাকানোর মিল। দুই অসম্ভব বিপরীতকে মেলানো। যেমন, উপুড় শবদেহের সঙ্গে শিশুর শয়নভঙ্গি। আরেকটা জায়গা দেখা যাক, 'ভাল ছেলে' উপন্যাসের প্রথম কয়েক লাইন :

> অনন্তের ক্লাস নাইনের এবং অমরের ক্লাস এইটের এগারো দিন পর অফিস থেকে বাড়ি ফেরার সময় বাসে উঠতে গিয়ে শক্তিপদ পিছলে চাকার তলায় চলে যায়। মৃত্যু সঙ্গে সঙ্গেই ঘটে। হাতে ছিল তাঁর দু'ছেলে অনন্ত আর অমরের জন্য দু'জোড়া চটির বাক্স।
>
> 'যদি ও-দুটো হাতে না থাকত তা হলে শক্তিদা হ্যান্ডেলটা ভাল করে ধরতে পারতেন।'
>
> মাস ছয়েক পর এক সন্ধ্যায় শক্তিপদের অফিসের সহকর্মী অবিনাশ কথাটা বলেছিল তাদের ঘরে বসে। অনন্ত আর অমর পরস্পরের দিকে তাকিয়েই চোখ সরিয়ে নিয়েছিল। ধীরে ধীরে পাংশু হয়ে যায় তাদের মুখ। মৃত্যুর তিন দিন আগে শক্তিপদ কয়েক আউন্স উল আর বোনার কাঁটা অনিমার জন্য আর এক বাক্স রং পেনসিল অলকার জন্য কিনে এনেছিলেন। ওরা ক্লাসে উঠেছে ফাইভে আর ফোরে।
>
> শীলা বলেছিল, 'মেয়েদের দিলে, আর ছেলেরা বুঝি ক্লাসে ওঠেনি?'
>
> অনন্ত আর অমর চোখ চাওয়াচাওয়ি করেছিল।
>
> 'মাকে বল না আমাদের চটি নেই।' অনন্ত বলেছিল। অমর একটু গোঁয়ার, মুখ আলগা। সে চেঁচিয়েই শীলাকে জানিয়ে দেয়, 'আমার আর দাদার জন্য চটি চাই।'
>
> সেই চটি কিনে বাসে উঠতে গিয়ে...অবিনাশ তাই বলেছিল, 'বাক্সদুটো



হাত থেকে পড়ে যাচ্ছিল, সামলাতে গিয়ে রড থেকে হাতটা পিছলে গেল।'

'বাক্স দুটোর কী হল, আমরা তো চটি পাইনি!' অমর ক্ষুণ্ণস্বরে বলেছিল।

সেই নির্মোহ এবং যেন একটু দূর থেকে বলা। কত সামান্য ব্যাপারের একটু এদিক-ওদিক ঘটলেই, মানুষের জীবন ও মৃত্যু জায়গা বদলাবদলি করে নেয়। এবং এখানে, একদিকে বলা হচ্ছে, বাক্স দু'টো হাত থেকে পড়ে যাচ্ছিল, সামলাতে গিয়ে রড থেকে হাতটা পিছলে গেল। কত তুচ্ছ একটা চটির বাক্স ফসকে গেল, আর ধরতে গিয়ে পরিবারের প্রধান উপার্জনশীল মানুষটির মৃত্যু ঘটল। তখন তার উত্তরে কিশোর পুত্রের আক্ষেপ : বাক্স দু'টোর কী হল, আমরা তো চটি পাইনি। হোক বালক-কিশোর, তবু, মানুষ তো, আর মানুষের মনটা কী করে চলছে, সেইটার একটা অচেনা কিন্তু সত্যি জায়গা দেখা গেল। অনেকটা একইরকম একটা জায়গা আছে, 'সহদেবের তাজমহল' উপন্যাসেও।

সহদেব একটু দোনামনা করে সামনের বাড়ির কড়া নাড়ল। দরজা খুলে দাঁড়াল অরুণকাকার ছোট ছেলে অনির্বাণ। ইলেভেন ক্লাসে পড়ে।

'বাবা কেমন আছেন?...মা কোথায়?'

'মা তো এইমাত্র হাসপাতালে গেল, বাবা এখন বিপদ কাটিয়ে উঠেছে।'

'আমি আজ দুপুরে দিল্লি থেকে ফিরে শুনলুম। কি যে হল শুনে...মাথাটা ঘুরে গেল। কত ছোট থেকে ওঁকে দেখছি, কত হুঁশিয়ার, সজাগ, সাবধানী আর তারই কি না এমন অ্যাকসিডেন্ট!...ডান পা?'

'হ্যাঁ, ডান পা। বাসটা ছেড়ে দিয়েছে আর বাবা হ্যান্ডেলটা ধরে চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে ছুটছে, ভীষণ ভিড় ছিল...'পা'টা রাখার একটু জায়গা দিন, একটু পা সরান', কেউ কি আর পা সরায়! তারপর লাফিয়ে পা রাখতেই পা'টা পিছলে যায়।...মাথার ওপর দিয়ে চাকাটা চলে যেত, বাবা রাস্তায় পড়া মাত্রই বুদ্ধি করে গড়িয়ে গেছল, নইলে...।'

সহদেব শিউরে উঠল। অনির্বাণ তা লক্ষ্য করে বলল, 'বাবা যদি আর বেঘতখানেক গড়াতে পারত পা'টা বেঁচে যেত।...হাঁটুর নীচেটা একদমই গুঁড়িয়ে গেছে।'

সহদেবের মতো আমিও শিউরে উঠি 'আর বেঘত খানেক যদি গড়াতে পারত'—কথাটা শুনে। কেননা, এইখানে আমরা বাস চলছে, এই সময়ে তার তলায় পড়ে থাকা একটি মানুষের অবস্থাটি যেন খুব কাছ থেকে দেখতে পাই। সে প্রাণ বাঁচার চেষ্টায় গড়াচ্ছে, আর চাকা এগিয়ে আসছে। কত অল্প কথায় পুরো অবস্থাটি ফুটে উঠল। এইখানে লেখক কল্পনাশক্তির প্রয়োগ করেছেন। কল্পনা মানে, 'কল্পনা' কথাটায় আমরা যা বুঝি সেটা নয়—কঠোর প্রত্যক্ষ বাস্তবকে, তার ডিটেলকে, কল্পনা দিয়ে ধরছেন। লিখনশক্তি কী সাংঘাতিক, এখানে বোঝা যায়। এর পাশাপাশি, ক্লাস ইলেভেন-এ পড়া কিশোর পুত্রের,

নৈর্ব্যক্তিক বিবরণ দেওয়াও ধাক্কা দেয়। যেন কোনও উত্তেজক খেলার বিবরণ দিচ্ছে। সে এই বিবরণ দেওয়ার সময় বাবার থেকে যেন বিচ্ছিন্ন। এ যেন ঠিক নিজের বাবা নয়। পরের ছোট বাক্যটিও মারাত্মক। 'হাঁটুর নিচেটা একদমই গুঁড়িয়ে গেছে।'

এই বিবরণটি সহদেব চরিত্রটির মধ্যেও সুড়ঙ্গ খুঁড়ে চলে। তার প্রমাণ প্রায় পরের মুহূর্তেই আমরা পাই।

প্রথম বাসটা সে ছেড়ে দিল। কেন জানি তার মনে হল, এটার পাদানিটা খুবই সরু সে ভালভাবে পা রেখে উঠতে পারবে না। পরক্ষণেই সে ভাবল, সব প্রাইভেট পাসের পাদানি তো এই রকমই আর সে রোজই দু-বেলা তা ব্যবহার করে বাসে ওঠে এবং তাই থেকে নামে। দ্বিতীয় বাসটা আসামাত্র সে উঠে পড়ল এবং ওঠার সময় অসুবিধে বোধ করল না। একটা কারণেই—'যদি আর বেঘতখানেক', এই কথাটা তার মাথায় খেলে গেছল।

মতি নন্দীর বিখ্যাত গল্প 'একটি পিকনিকের অপমৃত্যু'-তে একেবারে হাড়-জিরজিরে একটি ছেলে, যে, মেয়েদের ফাইফরমাস খাটতে পারলে কৃতার্থ, তাকে চারটি মেয়ে ওই ফরমাস খাটাবার ও তাকে নিয়ে মজাতামাসা করার জন্যই পিকনিকে একটি বাগানবাড়িতে নিয়ে যায়। তাদের সঙ্গে রয়েছে একটি নায়কপ্রতিম যুবক, বাগানবাড়িটা যাদের। সেই যুবকের ব্যবহার বরং শিবু নামক ছেলেটির প্রতি অনেকটাই দয়াপরবশ। মেয়েদের প্রচন্ড চাপাচাপিতে জলে নেবে প্রায় ডুবেই যাচ্ছিল শিবু। ছেলেটি জলে ঝাঁপিয়ে শিবুকে বাঁচায়। কিন্তু চারটি মেয়ে আবার ওই হাড়জিরজিরে শিবুকে বাধ্য করে ডাবগাছে উঠে ডাব পাড়তে। শিবু একটু যায়, আর হাঁপায়। থমকায়। দু'হাতে গাছের কাণ্ড জড়িয়ে ধরে নেমে আসতে চায়। তখন চারটি মেয়ে মরিয়া হয়ে ঢিল ছুড়তে থাকে। তাকে নামতে দেবে না। এখানে মতি নন্দীর বর্ণনা এইরকম :

খালি গায়ে, পাজামাটা উরু পর্যন্ত গুটিয়ে, শিবু প্রায় চারতলা উঁচু একটা নারকেল গাছে ওঠার চেষ্টা শুরু করল। ওরা গাছটাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে। কয়েক হাত উঠেই সে নেমে এল।

'পেটে বড্ড চাপ লাগছে।'

'জানতুম এইরকম একটা অজুহাত দেবে।' দীপালি স্থান ত্যাগ করার ভঙ্গি করল।

শিবু কথা না বলে আবার ওঠার চেষ্টা শুরু করল। ধীরে ধীরে সে দোতলার উচ্চতা পার হল। চারটে মুখে বিস্ময় ফুটল। শিবু তিনতলার কাছাকাছি পৌঁছচ্ছে। একজন হাততালি দিয়ে উঠল। শিবু গাছটাকে জড়িয়ে হাঁপাচ্ছে। দু'টো পা পিছলে যাচ্ছে বারবার, আঙুলগুলো বেঁকিয়ে আঁকড়ে ধরতে চাইছে, পারছে না। একটা ইটের টুকরো কুড়িয়ে শীলা শাসানি দিল, 'শিবু খবরদার। এক ইঞ্চি নেমেছো কি ইট ছুঁড়ে মাথা ফাটিয়ে দোব।' এই বলে সে ইট ছুঁড়ল। ঠক করে গাছে শব্দ হতেই ধড়ফড়িয়ে শিবু ওঠার চেষ্টা আরম্ভ করল। কয়েক হাত উঠে আবার সে জড়িয়ে রইল গাছটা। শরীর থরথর করে কাঁপছে, নিঃশ্বাস নিতে হাঁ করল, একটুখানি পিছলে নেমে এল!

সঙ্গে সঙ্গে চারটি মেয়েই ইট কুড়িয়ে এলোপাথাড়ি ছুঁড়তে শুরু করল।

'পারতে হবে। পারতেই হবে, নইলে নামতে দোব না।' উন্মাদের মতো দীপালি চিৎকার করে উঠল।

'আর একটু বাকি। শিবু চেষ্টা করো, চেষ্টা করো।' করুণা জোরে ইট ছুঁড়ল। শিবুর পাশ দিয়ে সেটা এবং এধারে শিবু, একসঙ্গে পড়ল। মাথাটা প্রথমে পাঁচিলে পড়ল সেখান থেকে দেহটা ছিটকে এল হাত পাঁচেক দূরে। বারকয়েক পা দু'টো খিঁচিয়ে শিবু মরে পড়ে রইল।

ওরা কেউ কাছে এগোল না। সুপ্রিয়াই প্রথম জড়ানো স্বরে টেনে টেনে বলল, 'আমি মোটে দুবার ছুঁড়েছিলাম, অনেক দূর দিয়ে চলে গেছে।'

শীলা শান্ত গলায় বলল, 'কারুর ইটই ওর গায়ে লাগেনি। বোকার মতো ওঠার চেষ্টা করেছিল, এটা অ্যাকসিডেন্ট।'

নীচের দিক থেকে উঠলে তৃতীয় যে প্যারাগ্রাফটি পাওয়া যাচ্ছে, সেটিই আমার লক্ষ্য। 'শিবু চেষ্টা করো, চেষ্টা করো। করুণা জোরে ইট ছুড়ল। শিবুর পাশ দিয়ে সেটা এবং এধারে শিবু, একসঙ্গে পড়ল। মাথাটা প্রথমে পাঁচিলে পড়ল, সেখান থেকে দেহটা ছিটকে এল হাত পাঁচেক দূরে।' এইখানে উত্তেজনা ও গল্প দু'টিই চূড়ায় উঠেছে। তারপর একটি লাইন, যেখানে শিবুর পাশ দিয়ে লক্ষ্যভ্রষ্ট ঢিল এবং শিবু দু'জনেই একইসঙ্গে পড়ল। ঢিল, বলা বাহুল্য, পাঁচিলের ওধারে চলে গিয়েছে। শিবু পড়ছে এধারে। এখানে তিনটি ছোট্ট বাক্যের মধ্যে কী ধরনের ভয়াবহ নিষ্ঠুরতা কত নির্বিকারভাবে বলা হল। ঢিল এবং শিবুর পাশাপাশি তথা একসঙ্গে পতন এটাই বলে, একটা ঢিলের মতোই তুচ্ছ ওই জীবন, শিবু, অন্যদের কাছে। কী অনবদ্য প্রিসিশন! একটি নিশ্বাসও যেন অধিক পড়বে না এই গল্পের। একজন মানুষ যতদিন বা যতটুকু বাঁচে, নিশ্চয়ই কয়েক সহস্র কোটি নিশ্বাস তার জন্য মাপা থাকে। তার ওপরে একটি অধিক নিশ্বাসও তার জন্য বরাদ্দ রাখেন না বিধাতা। এই লেখকও শব্দের বিধাতা।

শিবুর এই পতনের বর্ণনার পাশে আমার অন্য একটি পতনের বর্ণনা মনে পড়ছে। এখানে দু'টি চরিত্র, স্বামী-স্ত্রী। স্বামীর এক পা কাটা গিয়েছে দুর্ঘটনায়। সে বাড়ি বসা। মেয়েটি চাকরি করে। পুরুষটির নাম গিরি। তার মনের অবস্থা একটু চিনিয়ে দেওয়া যাক...

'নতুন কোনও জায়গায় রুনুর সঙ্গে যেতে তার অস্বস্তি হয়, বিশেষ করে কয়েক ঘণ্টা বসে থাকতে হলে। একবার মাত্র সে রুনুর অফিসে গিয়েছিল। সকলের নজর প্রথমেই ক্রাচের ওপর, তারপর রুনুর মুখে পড়ে। এমন সুশ্রী মেয়ের কিনা এমন খোঁড়া স্বামী, বেচারা।...বাড়ির এক মাইল বৃত্তের মধ্যে কেউ এখন আর তাদের দিকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকায় না। সকলে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে।'

এই গিরি ও রুনুর একটি পরিস্থিতি এবারে আসছে :

রুনু কখনও তার সামনে শাড়ি বদলায় না। কিন্তু সেদিন সায়া পরেই সে আলমারি থেকে ঘন বেগুনি রঙের সিল্কের শাড়িটা বার করল। ওই কাপড়ের ব্লাউজটাও বার করে, কী ভেবে আবার রেখে দিল।

'রাখলে কেন!'

'পরব?'

গিরি মাথা হেলাল। রুনু নিশ্চয় এখন ব্রেসিয়ার খুলবে না। স্নান এবং শয়ন ছাড়া ওটা সে ত্যাগ করে না। সেই মুহূর্তে গিরি, স্তনদ্বয় দেখার তীব্র ইচ্ছায় বশীভূত হয়ে পড়েছিল। দূর থেকে সে কখনও দেখেনি, কেন না খাটের চৌহদ্দির বাইরে রুনু কখনও উন্মুক্ত থাকেনি।

হয়তো রুনু বুঝতে পেরেছিল। ব্লাউজ খোলার পর কনুই তুলে কাঁধের ওপর দিয়ে হাত দু'টি পিঠের দিকে এনে হুকটা খোলার চেষ্টা করতে করতে বলল, 'ঘামে ভেজা পরতে বিশ্রী লাগে।'

'আমি খুলে দি।'

তিন গজ দূরে রুনু। কোনও রকম খুকিপনা না করেই পিঠ ফিরিয়ে দাঁড়াল। এক পায়ে হালকা তিনটে লাফ দিয়ে গিরি ওর কাছে পৌঁছল। হুকটা খুলে স্ট্র্যাপ দু'টো কাঁধ থেকে সরিয়ে দিল। মসৃণভাবে ব্রেসিয়ারটা ঝরে পড়ল মেঝেয়। কাঁধে হাত রেখে ঝুঁকে সে তাকিয়ে রইল। এখনও দৃঢ়, বৃন্তটা পনেরো বছর আগের থেকেও ভরে উঠেছে। গিরি চুমু খেতে শুরু করল, গলায়, ঘাড়ে বাহুতে বুকে। রুনু চোখ বন্ধ করে অস্ফুট শব্দ করল। দু'হাতে বেড় দিয়ে গিরি ওকে নিজের দেহে চেপে ধরল।

'ফিরে এসে।'

'না এখুনি।'

'আলো নেভাও।'

'না।'

হঠাৎ গিরি ওকে পাঁজাকোলা তুলে নিলে আগের মতো। সেই মুহূর্তে সে ভুলে গেছল তার আর একটা পা নেই। খাটের দিকে হেঁটে যেতে গিয়ে সে টলে পড়ল। প্রচণ্ড শব্দে দু'জনে মেঝেয় আছড়ে পড়তেই কাতরে উঠল রুনু।



অপ্রতিভ গিরি কিছুক্ষণ অবাক হয়ে খাটের গায়ে হেলানো ক্রাচের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে 'আশ্চর্য আমি ভুলেই গেছলুম।'

রুনুর কনুইটা ফুলে উঠেছিল।

এই আশ্চর্য অংশটিতে খাটের গায়ে হেলানো ক্রাচের অবস্থান লক্ষ করছে, মাটিতে পড়ে যাওয়া খঞ্জ পুরুষ চরিত্রটি। ওই কাঠের ক্রাচ, একভাবে, তার দৃঢ়তা-র, এমনকী পুরুষত্বের, প্রায় বিকল্প—যা এই ঘটনার পরেও নির্বিকার। হেলানোই আছে। এই পা-কাটা চরিত্রটি পুরুষত্ব হারিয়েছে এমন কোনও ইঙ্গিতই এই উপন্যাসে নেই। বরং হারায়নি এটাই নিশ্চিত। এক পা নিয়ে তার তিনটি লাফে একপ্রকার প্রাণী-দৌড় চিহ্নিত হয়। কিন্তু, তার হারিয়ে-না-ফেলা পুরুষত্ব, ধীরে ধীরে, দুর্ঘটনায় পা হারানোর সঙ্গে কীভাবে কীভাবে জড়িত হয়ে—পরিবর্তিত হয় সন্দেহের তীব্রতায়। নিজের যুবতী স্ত্রীকে সন্দেহ করে চলা, তাদের বাড়িতে পেয়িং গেস্ট হিসেবে থাকা তার দূর সম্পর্কের আত্মীয় যুবকের সঙ্গে। এই সন্দেহের ক্রমবৃদ্ধি ঘটে—এবং, একই বাড়িতে থেকে, নিজের সন্দেহ করাকে অন্যদের কাছে গোপন রাখতেও সে সক্ষম হয় অনেকদিন। তারপর একদিন, এই সন্দেহ তার কাছে প্রমাণিত হয়। সে বিছানায় ঘুমন্ত। মেঝেতে রুনু ঘুমোয়। মাঝরাতে দুঃস্বপ্ন দেখে তার ঘুম ভাঙতে, সে নীচে তাকিয়ে দ্যাখে রুনু নেই। এখানে দুঃস্বপ্নটিও বলা দরকার। 'ঘুম ভেঙে গেল বিশ্রী একটা স্বপ্ন দেখে। বারান্দায় ঝুঁকেছে দোতলার ঘরে নতুন বউটির কাপড় ছাড়া দেখার জন্য। তখন সে বেতাল হয়ে বারান্দা থেকে রাস্তায় পড়ে গেল।'

এই চরিত্রটি গ্যারাজে লরির নীচে ঢুকে কাজ করত। শূন্যে উঠিয়ে রাখা লরি, লিফ্‌টের যান্ত্রিক ত্রুটিতে দ্রুত নীচে নেমে আসে ও লোকটি তার জীবন বাঁচাতে পারে একটি পা হারিয়ে। এবার সে দেখল, মেঝেতে রুনু শুয়ে নেই।

কোথায় তা হলে! একমাত্র পা-টি বেয়ে কার যেন ঠান্ডা হাত উঠছে। গিরি ভয় পেল। কোথাও কোনও শব্দ নেই, তা হলে কি সে কালা হয়ে গেছে! দরজার পর্দাগুলো তোলা। রাস্তার আলোয় সামনের বাড়ির দেয়াল অবাস্তব জগতের মনে হচ্ছে। হঠাৎ গিরির মনে হল সে গ্যারাজে একা। রুনু এখন কোথায়? পাশের ঘরে? লিফ্‌ট, তার উপর আড়াই টন ট্রাক, নীচে সে দাঁড়িয়ে। গিরি ভয়ে থরথর করে কেঁপে উঠল।

ক্রাচের জন্য হাত বাড়িয়েও হাতটা ফিরিয়ে নিল। শব্দ হবে। হামা দিয়ে সে বারান্দায় এল। চেয়ারটা ছাড়া আর কিছু নেই। মাটি শুঁকে এগোনো কুকুরের মতো ঝুঁকে গিরি এগোল অম্বরের ঘরের দরজার দিকে। প্রাণ বাঁচানোর ব্যাপারে মানুষে-জানোয়ারে কোনও পার্থক্য নাকি থাকে না। রুনুই প্রাণ, প্রাণই রুনু। এখন রুনু ছাড়া আর চেতনায় কোনও কিছুর অস্তিত্ব নেই।

দরজাটা বন্ধ। মুখটা এগিয়ে দিয়ে সে দরজায় কান পাতল। ঠিক এইভাবেই সে রুনুদের বাড়ির ভিতরের ঘরে দরজায় একদিন কান পেতেছিল। তখন দু'পায়ে ভর দিয়ে সে দাঁড়াত।

ভিতরে কি কথা বলল কেউ? একটা অস্পষ্ট ধ্বনি যেন ভেসে আসছে অম্বরের ঘরের মধ্য থেকে। ধীরে ধীরে তার মাথাটা ঝুঁকে পড়ল। কাঁকালটা মেঝেয় রেখে দু'হাতের ভর থেকে দেহটা নামিয়ে দিল। এইভাবে সামনের বাড়ির লোকটাকে একদিন সে যোগব্যায়াম করতে দেখেছে। দরজার তলায় ফাঁক দিয়ে ধ্বনিটা দীর্ঘ হয়ে তীব্র হয়ে বেরিয়ে এসে একটা চিৎকারের আকৃতি নিল।

'বিশ্বাসবাবু, বিশ্বাসবাবু, শুয়ে পড়ুন।'

গিরি সেই নির্দেশ শুনেই উপুড় হয়ে বারান্দায় শুয়ে পড়ল।

'এইবার কি আমি বেঁচে যাব!'

উপুড় হয়ে হাঁফাতে লাগল গিরি। এখন বুঝতে পারছে, গভীর গর্তের তলদেশে সে পড়ে রয়েছে। এখান থেকে তার আর উদ্ধার নেই। বাঁচার কোনও উপায় নেই। সে দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত।

এও একরকম পতনেরই বর্ণনা। একদিন এই চরিত্রটি, যখন মাথার ওপর থেকে নেমে আসছে ভারী মৃত্যু, তখন সহকর্মীর এই চিৎকার শুনেছিল। কিন্তু শুয়ে পড়ার নির্দেশ মানেনি বলে আজীবন প্রতিবন্ধী হয়ে রইল। সে যখন তার যুবক-আত্মীয় সেই পেয়িং-গেস্ট অম্বরের সঙ্গে রুনুর মিলনের চাপা শীৎকার দরজার বাইরে শুনছে তখনও তার বর্ণনা এমনভাবে করা হয়েছে—যেন সে একটা জন্তু। এখানে যোগব্যায়ামের চিত্রটির উপস্থাপনা অভাবনীয়। এই শীৎকার-শব্দ শোনার পর সে একইসঙ্গে সেই শব্দের হাত থেকে বাঁচতে চায় এবং পিছন থেকে সহকর্মীর কণ্ঠ যেন এখানেও তার কানে পৌঁছয়। এবং সে জীবনে দ্বিতীয়বার আরেকটি গর্তের তলায় চাপা পড়ে। তার আগে, হামা দিয়ে এগোনোর ভঙ্গিও জন্তুর কথা মনে পড়ায়—পরের বাক্যেই বোঝা যায়, এই বর্ণনা সচেতনভাবে তৈরি করা হচ্ছে, সারাক্ষণ—একটি অমোঘ সত্য : প্রাণ বাঁচানোর ব্যাপারে মানুষ-জানোয়ারে কোনও পার্থক্য থাকে না। রুনু প্রাণ, প্রাণই রুনু। গিরির এই উৎকণ্ঠ হামা দিয়ে এগোনোয় আমার বার্গম্যান-এর ছবিতে আগুন-লেগে-যাওয়া ঘর থেকে হাতে হেঁটে বেরিয়ে আসা পঙ্গু যুবতীর চিত্র মনে পড়ে। যদিও সে-যুবতী ছিল যথাসাধ্য দ্রুত, ওদিকে গিরির গতি শ্বাসরোধী ধীরতায় নিয়ন্ত্রিত—তবু মনে পড়ে—কারণ দু'জনেই হাতে হাঁটে এবং দু'জনেই মরিয়া। এই উপন্যাসে গিরি চরিত্রটিকে চারিদিক থেকে এমন চাপ দেওয়া হয়েছে যাতে চরিত্রটি মাঝে মাঝে জন্তুর পর্যায়ে নেমে আসার উপক্রম করে। যদিও শেষ পর্যন্ত সে মানুষ হয়ে শক্ত পায়ে উঠে দাঁড়ায়—তার জীবনে একটি প্রেম আসার পর। কিন্তু, সে-কথা এখানে নয়। এই লেখার একটি প্রধান চরিত্র, মোহন, উপন্যাসে কীভাবে প্রথম প্রবেশ করছে তার বর্ণনা এইরকম :

সিঁড়িতে পায়ের শব্দটা উঠে আসছে। খুবই ধীরে, অসুস্থ মানুষের পদক্ষেপের মতো শব্দগুলো সময় নিচ্ছে। মোহন আসছে প্রায় তিন মাস পর।

মাথার সামনের চুল উঠে গিয়ে অর্ধেক খুলি মসৃণ বাদামি। বাকি চুল ঘন কালো। কপালটা উঁচু এবং গড়ানে। রগ থেকে কেঁচোর মতো একটা শিরা কানের উপরে পড়ে। সিঁড়ির বাঁকটায় মোহন দাঁড়িয়ে হাঁপাচ্ছে। গিরি শুধু

দেখতে পাচ্ছে মাথাটুকু।

নীল বুশ শার্টের দু'ধারে শীর্ণ ফ্যাকাশে দু'টি হাত ঝুলছে। চোয়ালের নীচে প্রবাল রঙের আঁচিল। গিরি ইউনিভার্সালে প্রথম যখন মোহনকে দেখে সর্বাগ্রে আঁচিলটাতেই চোখ পড়ে। এত ঝকঝকে, নিটোল এবং এমন লাল আঁচিল কখনও সে দেখেনি। ষোলো-সতেরো বছরে ওটা এখন প্রায় বৈঁচির আকার পেয়েছে। ওর হাতে সিগারেট তামাকের কৌটো।

সামনের দিকে চুল উঠে যাওয়ার বর্ণনায় 'অর্ধেক খুলি' কথাটা আসে। এবং গা শিরশিরে এই ছবি : 'রগ থেকে কেঁচোর মতো একটা শিরা কানের ওপর পড়ে।' এখানে 'কেঁচো' কথাটা। তাছাড়া যে আঁচিলটা আছে, তাও উপন্যাসে একাধিকবার ফিরে এসেছে। যেমন :

একটা মৃতদেহকে পোড়ানোর ব্যবস্থা হচ্ছিল। ওরা রাস্তা থেকেই দেখছিল। অল্পই বয়স বউটির। সিঁথিতে কেউ উপুড় করে দিয়েছিল সিঁদুর কৌটো। লাল বেনারসিতে ঢাকা। পা দু'টি আলতায় লাল। রুনু বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থেকে বলেছিল, 'বউটা যেন দোল খেলেছে। এমন লাল আমি দেখিনি।'

'মোহনের আঁচিলটা দ্যাখোনি?'

মোহন এসে রুনুর শরীরের দিকে তাকিয়ে থাকে গিরিকে গ্রাহ্য না করে—এবং বলে : 'তোর বউ তো দিনদিন বেশ সুন্দরী হয়ে উঠছে। আগেরবার এসে যা দেখেছিলুম, তার থেকেও বেশ—'

এবারে আরও একবার একটি বর্ণনার মুখোমুখি হতে হয়। 'বেশ' পর্যন্ত বলে থেমে যাওয়ার পর : 'মোহন গোলাকার একটা কিছু সন্তর্পণে শূন্যে তৈরি করে সেটিকে আলতো ধরে রইল।'

অবিশ্বাস্য! এই মোহন রুনুর মায়ের কাছে নিয়মিত যেত। একবার গিরিকেও নিয়ে যায়। ফলে, বয়সের তাড়নায় গিরি একাও যায় একবার। আর আজ, যখন মোহন সেকথা মনে করিয়ে দিয়ে গিরিকে বলে সেই যে একদিন দুপুরে তুই—তখন আঁচিলের বর্ণনাটি আর একবার ফেরত আসে : 'মোহনের ধূর্ত চোখে বেশিক্ষণ চোখ রাখতে পারল না গিরি। অবধারিত দৃষ্টি আঁচিলে সরে গেল। ওখানে একটা গভীর গর্ত দিয়ে রক্ত বেরিয়ে এসে শুকিয়ে ডেলা হয়ে রয়েছে যেন।'

খুলি, শোকযাত্রার সিন্দুর, কেঁচো, আঁচিলের থেকে অনর্গল কল্পিত রক্তক্ষরণ—মোহন চরিত্রটির সম্পর্কে গিরির ভয়, ঘেন্না, ও মৃত্যুশঙ্কা মেশানো একটি অপধারণা গোপন চিহ্ন আঁকতে আঁকতে চলে। এবং এর কারণ উপন্যাস যত এগোয় তত ধরা পড়তে থাকে।

এই মোহন সম্পর্কে গিরির এই মনোভাব, রুনুকে বলা গিরির একটি কথায় স্পষ্ট হয় ও পরবর্তী সংলাপে আরও গহ্বর উন্মোচিত হয় :

'যদি মোহন কথাটা কানে নিত। ওকে তিন দিন আগে একজন মেট জানিয়েছিল লিফটে লিক করছে, ভাল্ভ কক থেকে হাওয়া বেরিয়ে যাচ্ছে। লিফট বিপজ্জনক জেনেও আমাকে লরিটা চেক করতে পাঠিয়েছিল তলায় ঢুকে। হয়তো আশা করেছিল অ্যাকসিডেন্ট ঘটবে—আমি মরেও যেতে পারি।'

'কেন, তোমার মনে হল কেন?'

ওরা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইল। শুধু অন্যের চোখের সাদা অংশটুকু ছাড়া ওরা আর কিছু দেখতে পাচ্ছে না। তার দ্বারা বুঝতেও পারছে না, কী ভাবছে অপরে। নীরবতা অসহ্য হয়ে উঠতে গিরি অবশেষে বলল,

'তোমার প্রতি দুর্বলতা ছিল।'

গিরি সাবধানে 'আছে' শব্দটি এড়িয়ে গেল।

'বহুকাল আগের কথা।'

'তোমার মা চলে যাওয়ার পর দু'মাস কীভাবে তোমার চলেছিল?'

রুনু চমকাল না। স্বাভাবিক স্বরে বলল, 'ভিক্ষে করে চলেছিল।'

'এড়িয়ে যাচ্ছ প্রশ্নটা।'

'তোমার কী মনে হয়?'

'মোহনের কথাই মনে হয়।'

'তুমি তা হলে জানো।'

'কী জানি? তুমি আমায় কিছু তো বলোনি।'

'বলার মতো নয় বলেই জানাইনি। দু'মাস হাওয়া খেয়ে বেঁচে থাকা যায় না। তোমার কাছে হাত পাততে পারতুম, কিন্তু ওকেই বেশি পাকা লোক মনে হয়েছিল। এমন ক্ষেত্রে, বেঁচে থাকার প্রশ্নটাই বড় হয়ে ওঠে। শরীরকে শরীর দিয়েই বাঁচানো ছাড়া আমার আর কোনও উপায় ছিল না।'

এখানে পরস্পরের চোখের সাদা অংশ ছাড়া তারা কিছু দেখতে পাচ্ছে না—এই বর্ণনাও অনুধাবনযোগ্য। ওই সাদা এক ভয়ঙ্কর শ্বেত নীরবতা। চোখ নয়।

এরপর, গিরি একটি মেয়েকে প্রায় নিজের অজান্তে ভালবাসে। সে মেয়েটি, মোহনের গ্যারাজের এক ফিটারের মেয়ে। গিরির প্রথম দেখার অভিজ্ঞতায় সে কেমন : 'ফ্রক পরিয়ে তেরো-চোদ্দো বছরের মেয়ে বলে চালিয়ে দেওয়া যায়। রুগ্ন অপুষ্ট দেহ। মুখে বসন্তের ক্ষতের দাগ যে এতটা গভীর...বাঁ চোখটিতে মণি নেই তাই বন্ধ পাতা ভিতরে ঢুকে আছে। বুলিকে কখনও কোনও যুবক কামনা করবে না। এটা মোহন জানে। বুলিও হয়তো জানে। গিরি জানল।'

'বুলিও হয়তো জানে' কথাটা থেকে এর কয়েক পৃষ্ঠা পরে সরিয়ে দেওয়া হবে 'হয়তো' কে। যখন একটি সংলাপে বুলির কণ্ঠ বলবে : 'একটা আস্ত সুন্দর জিনিসকেই মানুষ চায়, খুব স্বাভাবিক। আমি আস্ত নই, সুতরাং আমাকে কেউ চাইবে বা ভালবাসবে, তাই কি মনে করব?' বুলির হাসিটা স্বতঃস্ফূর্ত ঠোঁটের ওপর দিয়ে ভেসে গেল : 'ভালবাসা কোনওদিনই পাব না, দেবোও না।'

এই বুলিকে, তার বাবার দারিদ্র্যের সুযোগে এবং সে এতদূর কুরূপা হওয়ার ফলে—মোহন এনে রেখেছে ঘর ভাড়া করে। খরচ চালায়, এবং একে ভোগ করে। মেয়েটি মেনে নিয়েছে। গিরি, মোহনকে না জানিয়ে, মেয়েটি কাছে যাতায়াত শুরু করে। ছোট ছোট বর্ণনায় বুলির তাকানো ফুটে উঠছে। 'সরল কৌতুক ঝিকমিক করছে একটা চোখে।' অথবা 'ওর একমাত্র চোখটি বিস্ময়ে ভরা।' এবং বিশেষভাবে এই জায়গাটি :

—'লাগল?'

বুলির ডান হাতের আঙুলগুলো গিরির বাম বাহুটা আঁকড়ে ধরল। গিরি ওর একমাত্র চোখটিতে ভয় লজ্জা বেদনা একসঙ্গে দেখতে পেল।

বুলি ধরে আছে হাতটা। গিরির মনে হল তার সারা শরীর থেকে স্নেহলোভী একটা উত্তাপ হাতের ওই জায়গাটার দিকে হামা দিয়ে এগোচ্ছে। আলতো করে সে বুলির আঙুলগুলোর ওপর ডান আঙুল রাখল।

'সামান্য। এখনও ভাল শুকোয়নি।'

মিথ্যে কথা। কিন্তু মিথ্যা বলার এত ভাল সময় কমই জীবনে আসে।'

রুনু এবং গিরি যখন পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রয়েছে আর অন্যের চোখের সাদা অংশ ছাড়া ওরা কিছু দেখতে পাচ্ছে না—এবং একটিমাত্র চক্ষু থেকে উৎসারিত স্নেহ মমতা বিস্ময় কৌতুকের বিচ্ছুরণ—এই দু'টি জিনিস কীভাবে পাশাপাশি রাখা হয়েছে। অন্যদিকে, গিরির শরীর থেকে যে একটা স্নেহলোভী উত্তাপ জাগছে, সেটা হাতের ওই জায়গার দিকে 'হামা দিয়ে এগোচ্ছে' বলায়—রুনু এবং অম্বরের বন্ধ ঘরের দরজার নীচে স্ত্রীর শীৎকার-শব্দের সন্ধানে গিরির হামা দিয়ে এগোনো প্রায়-জন্তুভঙ্গির সঙ্গে, একটা উল্টোদিকের পরিপূরক যোগ দেখিয়ে দেয় এই হামা দেওয়ার প্রয়োগ। বুলি নিজেকে আস্ত নয় বলে জানে। গিরি তা মেনে নিয়েও, নিজের কথা মনে করিয়ে বোঝায় : 'কিন্তু দু'টো ভাঙা জিনিস জোড়া দিয়ে একটা আস্ত হয়। হতে পারে।'

ওরা জোড়া লাগে। দু'টো ভাঙা জিনিস ভালবাসতে পারে

পরস্পরকে। আর সেই মুহূর্তটি আসে খুব অল্পক্ষণের জন্য। 'দু'টো ভাঙা জোড়া দিয়ে একটা আস্ত? হয় কখনও! দাগ একটা রয়েই যাবে।'

বুলি সরে এল গিরির পাশে। বালিশে হেলান দিয়ে গিরি হাসল। বিছানায় বুলির হাত। তার ওপরে সে আলতো হাত রাখল।

'কী হারিয়েছেন বলছিলেন।'

গিরি নিজের বুকের ওপর হাত রাখল।

'আপনি তো বেঁচে আছেন।'

'না।'

বুলি এগিয়ে এসে ঝুঁকে গিরির বুকে কান পাতল।

'দপদপ করছে।'

আলতো ওর মাথায় হাত রাখল গিরি।

করছিল না, এইমাত্র করে উঠল।

বুকের ওপর গলিত অন্ধ চোখ আর ক্ষতে খোদলানো মুখটা চেপে ধরল বুলি। গিরি চোখ বুজল।'

ব্যস। বলতে গেলে এইটুকুই ওদের সেই অর্থে প্রত্যক্ষ কাছে আসা। ওরা মনে মনে কাছাকাছি এসেছিল। অসম্ভব হওয়া সত্ত্বেও প্রেম জন্মেছিল ওদের মধ্যে। কিন্তু কাছে আসাটা প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে পড়ে। বা ভেঙে পড়তে বাধ্য হয়। আর এইখানেই এসে পড়ে আর একটি পতন। সেই পতনটির বর্ণনাও শ্বাসরোধী।

খসখসানি শব্দ হল। চোখ খুলল গিরি। পর্দা সরিয়ে মোহন তাকিয়ে রয়েছে। দু'চোখ ভরে অবিশ্বাস। গিরির চোখ আটকে রইল লাল আঁচিলটায়। মুহূর্তে সেটা টকটকে হয়ে উঠল, তারপর সারা মুখ হিংস্র রাগে কুঁচকে গেল।

মোহন হাত বাড়িয়ে বুলির চুলের গোছা ধরে হ্যাঁচকা টান দিল। অপ্রত্যাশিত এই আক্রমণে আর্তনাদ করে বুলি দাঁড়িয়ে উঠতেই মোহন ঘাড়ে ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে দিল। কাত হয়ে মেঝেয় পড়ে থাকা বুলির মুখের উপর মোহন ডান পা রেখে চেপে ধরল। গোঙিয়ে উঠল বুলি।

ছয়-সাত সেকেন্ডের মধ্যে ব্যাপারটা ঘটল। কিছু চিন্তা করার সময় নিল না গিরি। নিছক প্রবৃত্তিবশে সে খাট থেকে হাত বাড়াল। অ্যাক্সেলের ভাঙা খণ্ডটা ওর জন্যই যে অপেক্ষা করছে। দ্রুত উঠে দাঁড়াল এক পায়ে। টলে পড়ার আগেই সে বুলির মুখ পা দিয়ে মেঝেয় ঘষায় ব্যস্ত, কুঁজো হওয়া মোহনের মাথার পিছনে সজোরে লোহার ঘা মারল।

মোহন স্থির হয়ে রয়েছে। গিরি মাথাটার দিকে তাকিয়ে। পাতলা চুলের মধ্যে দিকে নারকেল শাঁসের মতো সাদা একটা দাগ। সেটায় ক্রমশ গোলাপি রং ফুটে উঠছে। মোহন পাশে হাত বাড়াচ্ছে কিছু একটা ধরার জন্য।

একটা শ্রান্ত লোকের মতো, পর্দাটা মুঠোয় আঁকড়ে, মোহন একটু একটু করে দুমড়ে মুচড়ে মেঝেয় বসে পড়ল। পার্টিশনটাকে কাঁপিয়ে একবার ওঠার চেষ্টা করল এবং নিজের সঙ্গে কয়েক মুহূর্ত ধস্তাধস্তির পর যুক্তিগ্রাহ্যভাবে নিজের প্রাণহীন দেহটাকে শুইয়ে দিল কাত করে।

এক পায়ে উঠে দাঁড়ানো গিরি 'টলে পড়ার আগেই' প্রাণপণ শক্তিতে আঘাত করছে। এবং তারপর নিজেও পড়ে গিয়েছে।

রুনুকে আদর করতে গিয়ে, 'নিছক প্রবৃত্তিবশে' গিরি ভুলে গিয়েছিল একটা পা নেই। পাঁজাকোলা করে তুলে খাটের দিকে এগোতে গিয়ে পড়ে যায়। শারদীয় সংখ্যায় যখন 'বারান্দা' প্রথম প্রকাশ পায় তখন একটি বর্ণনা ও সংলাপ ছিল রুনুর। মেঝেতে পড়ে থাকা "রুনুর মুখে ঘাম ফুটে উঠেছে। লেগেছে, বেশ বোঝা যায়। 'সরো।'"

এই দুই পতনের মধ্যে একটি যোগ তৈরি হয়। ধীরে ধীরে, অনেক সময় নিয়ে, সবচেয়ে মারাত্মক পতন মোহনের। আঘাতক্ষত প্রথমে সাদা। সাদা নারকেলের শাঁস-এর ছবিতে অনুমান হয় ঘিলু এসে গিয়েছে। তারপর গোলাপি রং ফুটছে। এর আগে, মোহনের গলার সেই আঁচিল পূর্ণ রক্তবর্ণ নিয়ে এই উপন্যাসে শেষবারের মতো ঘুরে যায়। সদ্যগুলিবিদ্ধ জন কেনেডি-র মাথা যখন তাঁর স্ত্রী জ্যাকেলিন-এর দিকে ঝুঁকে পড়ছে, তখন আরেকটি গুলির আওয়াজ হল এবং কেনেডির মস্তিষ্কের একটি টুকরো জ্যাকেলিনের কোলে ঝরে পড়ল। জ্যাকেলিন পরে বলেছেন, 'সেই মুহূর্তে সেখানে (কেনেডির মাথার ক্ষতস্থানে) আমি কোনও রক্ত দেখতে পাইনি। কিন্তু পরমুহূর্তে সেখানে রক্ত ছাড়া আর কিছু ছিল না।'

মোহনের পতনের এই বর্ণনা দীর্ঘ দীর্ঘদিন মনে গেঁথে থাকে। তীরের মতো বিঁধে থরথর করে। তেমনই গলিত অন্ধ চোখ আর ক্ষতে খোদলানো মুখ নিয়ে অপ্রাপণীয় পুরুষের বুকে বুলির মুখ রাখা—প্রেমদৃশ্য বর্ণনার অসামান্যতায় বাংলা সাহিত্যে প্রায় একাকী হয়ে থাকে।

সম্প্রতি কালে রচিত 'কানাইলালের রেহাই' উপন্যাস যখন শারদসংখ্যায় ছাপা হয় তখন তার শেষ দৃশ্যে একটি বর্ণনা ছিল। কানাইলাল নামের শক্তসমর্থ সত্তর-উত্তীর্ণ একজন বৃদ্ধ নিজেকে শেষ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে ছাদে উঠে গেলেন। দেখলেন উল্টোদিকের বাড়ির ছাদে, সে-বাড়ির কিশোরী কাজের মেয়েটি কিছু চুরি করে এনে খাচ্ছে। স্নেহশীল কানাইলাল, সেই নাতনি-সমা কিশোরীকে ছদ্ম-ধমকে জিগ্যেসও করলেন, কী করছিস রে তুই। সেও 'কিছু না দাদু, বা তুমি কী করছো ছাদে?' বলে লুকিয়ে পড়ল। কানাইলাল চিলেকোঠার ঘরটায় ঢুকলেন। তারপর, আগেই এখানে এনে রাখা কেরোসিনের টিন দু'হাতে তুলে ছিটিয়ে ছিটিয়ে নিজের পরে থাকা গেঞ্জি আর পাঞ্জাবির বুক-পিঠ ভাল করে ভেজালেন। টিন নামিয়ে রেখে দেশলাই বাক্স খুলে একটি কাঠি বার করলেন।

উপন্যাসটি এই জায়গায় শেষ হয়। এই বর্ণনাটি আক্ষরিক নয়। স্মৃতি থেকে বিবরণ দিলাম মাত্র। কানাইলাল যখন কেরোসিন টিন দু'হাতে স্নানের বালতির মতো ধরে নিজের পরনের গেঞ্জি-পাঞ্জাবির বুক-পিঠ ভাল করে ভেজাচ্ছেন, তখন গা শিরশির করতে থাকে—যেন মনে হয় আমার পরে থাকা পোশাক ভিজে উঠছে ওই কেরোসিনে।

অবশ্য কানাইলালের রেহাই যখন পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় 'বনানীদের বাড়ি' নামক গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়ে, তখনও সেখানে শেষ দৃশ্যে কানাইলালের ছাদে উঠে যাওয়া থাকে। পরের অংশটি পরিবর্তিত হয় একটি পতনে।

একটি মানুষ আত্মহত্যা করতে চলেছে—কিন্তু কত নির্বিকার। সেই নির্বিকারত্ব সংশোধিত দ্বিতীয় অংশেও রয়েছে। মনে রাখতে হবে এইমাত্র একটা লোক মৃত্যুলিপি লিখল। তারপর :

'প্যাড থেকে কাগজটা খুলে ভাঁজ করার আগে কানাইলাল চিঠিটা পড়লেন। তাঁর মনে হল মহার্ঘ শব্দটার বানানে একটা 'য'ফলা বসবে। ঘরে অভিধান নেই। থাকগে তোজুকে জাগিয়ে তুলে অভিধান চাওয়ার মানে হয় না। তিন পাট করে চিঠিটা ভাঁজ করে তাতে বড় অক্ষরে লিখলেন শ্রীমান তেজেশচন্দ্র সিংহ। টেবিলের মাঝখানে চিঠিটা রেখে, ময়লা গেঞ্জিটা খুলে সাদা পাঞ্জাবি আলমারি থেকে বার করে পরলেন। চিরুনি দিয়ে চুলের পাট ঠিক করলেন। টেবলল্যাম্প নিভিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে ছাদের সিঁড়ি ধরলেন।'

দু'মিনিট পর রাস্তায় বিশ্রি একটা ভারি কিছু পড়ার শব্দ হল। আর ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল আতঙ্কিত, একটা কুকুর।

ওই ভারী কিছুর পতন-শব্দ পাঠককে তাড়া করে বেড়াবে। ছাদ থেকে লাফ দিয়ে আত্মহত্যা করতে যাওয়ার আগে কেউ যত্ন করে চুল আঁচড়ায়?' বানানে 'য' ফলা হবে কি না তা নিয়ে মাথা ঘামায়? পরিষ্কার পাঞ্জাবি বের করে পরে? কী শান্ত কী নিরুদ্বেগ এই ছাদের সিঁড়ি ধরা! এই হলেন মতি নন্দী। মানুষের গভীরতম অন্ত-স্থলে তিনি প্রবেশ করান পাঠককে। যেন পাতালে নিক্ষেপ করেন। বেরোবে সে নিজের চেষ্টায়। অথবা আজীবন বেরতে পারবে না। আমি যেমন পারিনি।

ছবি : তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

অপরাজিত আনন্দ ▲ রূপক সাহা

তারক চ্যাটার্জি লেনের সেই লোকটা

যে বলেছিল 'লেগওয়ার্ক করো। অভিজ্ঞতার ঝুলি বাড়াও। টেবিলে বসে ভাল লেখা হয় না'। আর বলেছিল 'ছাপতে দেওয়ার আগে বারবার লিখি। এতে লেখার সংখ্যা কমে যায়। তাতে কিছু যায় আসে না।'

'এই মতি...শীতের মিঠে রোদ্দুর...তুই যা।'

মতি নন্দীর মরদেহ নিয়ে আমরা সেদিন বেরিয়ে আসছি, তাঁর পুরনো পাড়া তারক চ্যাটার্জি লেন থেকে। গলির মুখে পৌঁছনো মাত্র কে যেন ওই কথাগুলো বলে উঠলেন। শুনে চমকে বাঁ দিকে তাকালাম। যাঁকে দেখলাম, তাঁকে চিনি। মতিদার ছোটবেলাকার বন্ধু ড. বিমান মুখার্জি। প্রখ্যাত গায়ক, সুরকার। বাড়ির চৌকাঠে দাঁড়িয়ে রঙিন ফুল ছুড়ে দিয়ে, 'তুই যা' বলেই, তিনি ডান হাতটা শূন্যে ভাসিয়ে দিলেন। যেন এগিয়ে দিলেন মতিদাকে, অনন্তকালের দিকে।

শেষ যাত্রায় সেদিন সামনে-পিছনে অনেক মানুষ। মতিদার দেহ নিয়ে শববাহী-যান নিমতলা মহাশ্মশানের দিকে চলে গেল। সেটি ধাওয়া করার বদলে, গলির মুখে আটকে গেলাম। মনে একটা প্রশ্ন। চিৎকার করে বিমানদা ওইভাবে বিদায় সম্ভাষণ করলেন কেন? কেন বললেন, 'শীতের মিঠে রোদ্দুর' কথাটা? শোকের আবহে বেমানান ওই বর্ণনা, ভীষণ ভাবাতে লাগল আমাকে। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি, হাত ধরে কে একজন বাড়ির ভিতরে নিয়ে যাচ্ছেন অসুস্থ বিমানদাকে। প্রশ্নটা তাই করা হল না। ভাবলাম, নতুন বছরের প্রথম রবিবার। জাঁকিয়ে ঠান্ডা পড়েছে। রোদ্দুরটা সত্যিই মিঠে বলে মনে হচ্ছে। আলসে আমেজ। হয়তো সেই কারণেই বিমানদা বলে ফেলেছেন।

সাংবাদিকতার পেশায় আসার পর থেকে মতিদার মুখে শুনেছি, 'রাস্তা-ঘাটে সবসময় চোখ কান খোলা রাখবে। দেখবে, সামান্য একটা কথা চেজ করেই অসামান্য একটা খবর পেয়ে যাবে।' সত্যি, পরে অনেক খবর এভাবে পেয়েওছি। আবার প্রমাণ পেলাম, দিন কয়েক আগে বিমানদার বাড়িতে গিয়ে। জানার সেই তাগিদ। 'শীতের মিঠে রোদ্দুর' কথাটা সেদিন উনি বলেছিলেন কেন? আলাপচারিতা শুধু মতিদাকে ঘিরেই। উঠে এল অনেক অজানা কাহিনি। বয়স আশির কাছাকাছি, তবুও বিমানদার স্মৃতি এত জ্বলজ্বলে, মনে হচ্ছিল, যেন এই সেদিনের ঘটনা বলছেন।

'এই তারক চ্যাটার্জি লেনের গলিতেই আমাদের বেড়ে ওঠা, বুঝলে?' বিমানদা বললেন, 'ছাত্রাবস্থা থেকে আমাদের বন্ধুত্ব। বাড়ির কাছেই নরেন দেব পার্ক। আমরা পনেরো-ষোলোজন মিলে রোজ বিকেল থেকে রাত্তির পর্যন্ত, আড্ডা মারতাম সেখানে। কতরকম গল্প, আলোচনা। শিবে...মানে কবি শিবশম্ভু পাল, মোহিত...মানে নাট্যকার মোহিত চট্টোপাধ্যায়, আর মতি লেখালেখি করত। আমার ঝোঁক গানের দিকে। মতিও গান খুব ভালবাসত। আমরা দু'জন জগন্ময় মিত্রের খুব ভক্ত ছিলাম। আমার স্বপ্ন তখন, কমল দাশগুপ্তর মতো সুরকার হব। আর মতির ইচ্ছে, হীরেন বসুর মতো গীতিকার হবে। একবার...বোধহয় পঞ্চান্ন সালের কথা। অনুপম ঘটকের সুরে হেমন্ত-র (মুখার্জি) একটা গান বেরল। শুকনো শাখায় পাতা ঝরে যায়। গানের সুরটা আমাদের খুব ভাল লেগে গিয়েছিল। মতিকে আমি বললাম, ইস আমি যদি এরকম সুর দিতে পারতাম...। কিন্তু গান লিখে দেবে কে? তুই লেখ না, আমি সুর দেব। শুনে মতি চুপ করে রইল। পরদিন সকালেই ও গান লিখে নিয়ে এসে হাজির। বলল, 'এবার তুই সুর দে।'

'আপনার মনে আছে সেই গান?'

'নিশ্চয়ই মনে আছে। হেমন্তর...'শুকনো শাখায়'...গানের স্টাইলেই আমি সুর দিয়েছিলাম। তেতাল্লিশ বছর পর সেই গান গাইয়েছি ইন্দ্রাণী সেনকে দিয়ে। ওহ্, কী তার কথা! মতি অনেক গান লিখেছিল। আমি সুরও দিয়েছি। প্রথম সেই গানটা গাইব?' বলেই বিমানদা হারমোনিয়াম টেনে নিয়ে গাইতে শুরু করলেন—

'শীতের ভোরবেলা/শিশির করে খেলা/পদ্মপাতার সাথে,
কুহেলি ওড়না ঢেকে/রাতের সহেলি/কেন এলে গো প্রাতে।
সকালের ফুলেরা/রাতজাগা বিলাসে, ঘুমে ভারি পাতায়/
ঢুলে পড়ে আলসে, কুঁড়িদের জানাতে/ভ্রমর আসেনি,
কী তুলে দেব তোমার হাতে?'

গান থামিয়ে হঠাৎ বিমানদা বলেন, 'একটু আগে তুমি জানতে চাইছিলে, মতি মারা যাওয়ার দিন কেন আমি শীতের মিঠে রোদ্দুর কথাটা বলেছিলাম। তার কারণ, ওর ডেডবডি-টা দেখার পর, আমার এই গানটার কথাই মনে পড়েছিল। ওই যে...শীতের ভোর নিয়ে লেখা যে। কত বছর আগে লেখা গান, তবুও প্রতিটি লাইন এখনও মনে আছে। তোমরা মতিকে গদ্যলেখক হিসাবে জানো। ও কিন্তু অনেক বড় গীতিকার হতে পারত। গানটা ও এত ভালবাসত যে, সেই সময় ওর উদ্যোগে এ পাড়ায় আমরাই প্রথম নজরুলজয়ন্তী করেছিলাম। পরপর বেশ কয়েকবার। একবার তো সভাপতিত্ব করার জন্য ও নিয়ে এসেছিল পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়কে। গানের কথা উঠল বলেই বলছি, একানব্বই সালে মতি ইন্টারভিউ দিয়েছিল অল ইন্ডিয়া রেডিও-তে। সেটা নিয়েছিলেন ফুটবল কোচ অমল দত্ত। সেখানে মতি বলেছিল, পুজোর সময় জলের ট্যাঙ্কের ওপর পা ঝুলিয়ে বসে, আমরা দু'জন কী কী গান গাইতাম।' কথাগুলো বলেই নির্মল হাসিতে মুখ ভরিয়ে দিলেন বিমানদা।

'মতিদা তখন কী করতেন?'

'মতি তখন জয়পুরিয়া কলেজের সামনে একটা অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ট্রেনিং স্কুলে ভর্তি হয়েছিল। বাড়ির চাপ, কিছু করে খেতে হবে তো? তারপর বেলঘরিয়ায় স্টেট ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন-এর ডিপোয় অ্যাপ্রেন্টিস হল। তারও পর, হঠাৎ ও আনন্দবাজার আপিসে লেখালেখির সুযোগ পেয়ে গেল। ওখানে ঢোকার পর থেকেই, ওর গানের চর্চায় ছেদ পড়ল। কাগজের আপিস থেকে বাড়ি ফিরত অনেক রাত্তিরে। আমাদের বিকেলের আড্ডার বারোটা বেজে গেল। একটা সময় মতি পাড়া ছেড়ে বিধান শিশু উদ্যানের দিকে চলে গেল। ফলে আমাদের যোগাযোগটা আরও কমে গেল।'

গীতিকার মতি নন্দী! ঠিক মেলাতে পারছিলাম না। মতিদার সঙ্গে আমার সম্পর্ক প্রায় ছত্রিশ বছরের। উনি গান লিখেছেন, কখনও শুনিনি। নিজে কখনও বলেনওনি। গান সম্পর্কে ওঁর একটা আগ্রহ ছিল, সেটা জানতাম। ওয়েলিংটন স্কোয়ারের কাছে কোন ফুটপাতের দোকানে পুরনো গানের কোন রেকর্ড পাওয়া যায়, অবলীলায় তা বলে দিতে পারতেন। আনন্দবাজার অফিসের ক্রীড়া দফতরে বিকেলের দিকে অনেক পেশার লোকজনই আড্ডা মারতে আসতেন। তখন টের পেতাম, ওস্তাদ গাইয়ে-বাজিয়েদের সম্পর্কে মতিদা বেশ খোঁজখবর রাখেন। মনে আছে, একবার এক সংগীত সমালোচক ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলি খাঁ সম্পর্কে ভুল তথ্য দিয়ে খুব বকুনি খেয়েছিলেন মতিদার কাছে। অনেকেই জানতেন না, মতিদা খুব ভক্ত ছিলেন আমেরিকান



তারক চ্যাটার্জি লেন—মতি নন্দীর বহু গল্প-উপন্যাসের রসদ জুগিয়েছে যে। ছবি : তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

লোকসংগীত গায়ক হ্যারি বেলাফন্তে-র। যাঁকে বলা হত 'কিং অব ক্যালিপসো।' ওঁর বাড়িতে কালো ওই গায়কের ক্যালিপসো গানের ক্যাসেট, খুঁজলে হয়তো এখনও পাওয়া যাবে। ব্যানানা বোট সং। বাড়িতে কখনও কখনও উনি রবীন্দ্রসংগীত আর নজরুলগীতি শুনতেন। সেই সময় কেউ কথা বললে মতিদা খুব বিরক্ত বোধ করতেন।

বিমানদার বাড়ি থেকে বেরিয়ে তারক চ্যাটার্জি লেনের গলিতে এসে দাঁড়াতেই মনে হল, গানের প্রতি মতিদার টান থাকাটাই তো স্বাভাবিক। এই গলিতেই থাকতেন প্রখ্যাত গায়ক রামকুমার চট্টোপাধ্যায়। তবে রামকুমারের সঙ্গে মতিদার সম্পর্কটা বিমান মুখার্জির মতো গভীর ছিল না। প্রথম যেদিন মতিদার বাড়িতে যাই, সেদিনই উনি ছাদে নিয়ে গিয়ে, খুব গর্বের সঙ্গে, গলির চারটে বাড়ি দেখিয়েছিলেন। প্রথমে ভারতবিখ্যাত দুই খেলোয়াড়ের বাড়ি। দুই 'পদ্মশ্রী' গোষ্ঠ পাল আর আরতি সাহার। তার পর দুই গায়ক রামকুমার ও বিমান মুখার্জির। ফুটবলের কিংবদন্তি গোষ্ঠ পাল তিরিশ নম্বর তারক চ্যাটার্জি লেনে ভাড়া বাড়িতে থাকতেন। পরে নর্দান অ্যাভেনিউ-তে নিজে বাড়ি করে চলে যান। ষোলো নম্বরে থাকতেন ইংলিশ চ্যানেল পেরনো ভারতের প্রথম মেয়ে-সাঁতারু আরতি সাহা। আমৃত্যু তিনি তাঁর শ্বশুরবাড়িতেই ছিলেন। পঁচিশ নম্বরে থাকতেন মতিদা। সাহিত্য অ্যাকাডেমি পুরস্কার পাওয়া লেখক। পাঁচের এক নম্বর বাড়িটা ছিল রামকুমারের। তিনিও এখন বেঁচে নেই। তবে আঠারো নম্বর বাড়িতে এখনও আছেন বিমানদা। শেষ যে-দু'জনের কথা বললাম, তাঁরা রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি লিট। দু'শো আড়াইশো গজ লম্বা একটা সরু গলি তারক চ্যাটার্জি লেন। অথচ কত প্রতিভার ছড়াছড়ি! এমন নজির দেশে আর কোথাও নেই। পুরসভার উচিত, উত্তর কলকাতার ওই গলিটাকে সোনা দিয়ে মুড়ে দেওয়া।

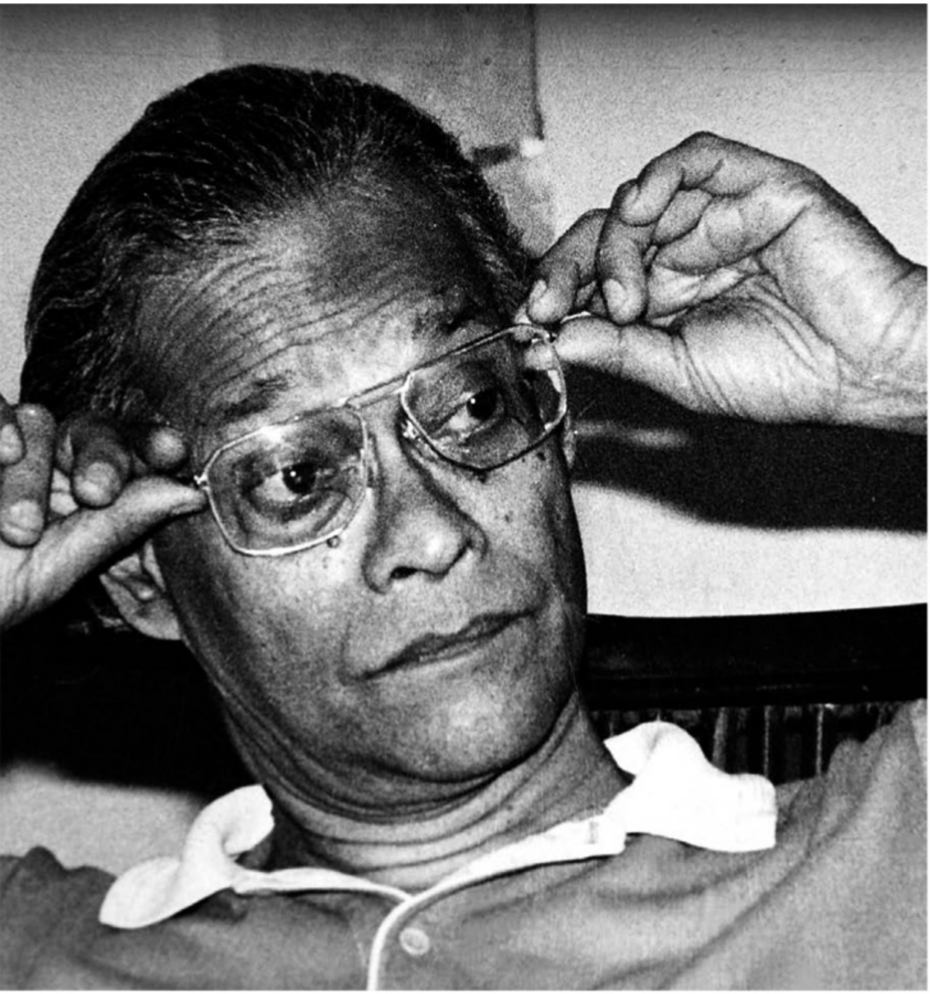
উত্তর কলকাতা নিয়ে মারাত্মক গর্ব ছিল মতিদার। তারক চ্যাটার্জি লেন নিয়ে তো বটেই। এই কিছুদিন আগে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এক মহিলা-গবেষক মতিদার কাছে হাজির। মতিদার খেলার উপন্যাস নিয়ে তিনি গবেষণা করছেন। মনোবাসনা জানাতেই মতিদা স্নেহচ্ছলেই তাঁকে প্রশ্ন করলেন, 'আমি যে গলিতে বড় হয়েছি, সেই তারক চ্যাটার্জি লেনে তুমি কি কখনও গেছ?' মহিলা গবেষক ঘাড় নেড়ে জানালেন, তিনি কখনও যাননি। মতিদা তখন তাঁকে বললেন, 'সে কী! আমার ওপর রিসার্চ করতে হলে, আগে ওই গলিতে যেতে হবে। না হলে তোমার রিসার্চ যে ইনকমপ্লিট হয়ে থাকবে।' সেই গবেষক মতিদার জীবদ্দশায় হয়তো সময় পাননি। মৃত্যুর খবর পেয়ে দৌড়ে এসেছেন, তারক চ্যাটার্জি লেনে যাবেন বলে। শবানুগমন করে আমাদের সঙ্গে তিনি গেলেনও ওই গলিতে। শুনে আমারও খুব ইচ্ছে হল, আরও একবার এই গলিতে আসতে হবে। মতিদাকে ভালভাবে জানার জন্য।

আনন্দবাজারের চাকরি পাওয়ার অনেক আগে থেকেই মতিদার ওই বাড়িতে আমার যাতায়াত। প্রথম যাই '৭৪ সালের গোড়ার দিকে। ততদিনে উনি 'স্ট্রাইকার' উপন্যাসটা লিখে হইচই ফেলে দিয়েছেন। এক তরুণ ফুটবলারের স্বপ্নপূরণের কাহিনি। তখন আমি ঐক্য সম্মিলনী ক্লাবে ফুটবল খেলি। 'স্ট্রাইকার' পড়ে মনে হয়েছিল, এ তো আমার জীবনেরও গল্প! আমার মতো হাজার-হাজার হবু ফুটবলারের। আমার স্বপ্নপূরণ হয়নি, কিন্তু গল্পের নায়ক প্রসূনের তো হয়েছে। তাতেই ভাল লাগার একটা রেশ আচ্ছন্ন করে রাখত, যতবার পুজোসংখ্যার ওই 'আনন্দমেলা' পড়তাম, ততবার। তাই মতিদার বাড়ির চিলেকোঠায় বসে প্রথমেই আমার যে কৌতূহলটা জেগেছিল, সেটা হল, উনি ঠিক কোন জায়গাটায় বসে ওই অসামান্য উপন্যাসটা লিখেছেন। ছাদে আট বাই দশ একটা ঘর। দক্ষিণ দিকে সিঙ্গল খাট, পূর্বদিকে একটা টেবিলের ওপর বেশ কিছু বই। পাশেই ফোল্ডিং আর একটা টেবিল এবং চেয়ার। তলায় পানের বাটা, জাঁতি। আমার



দৃষ্টি গিয়ে পড়েছিল ফোল্ডিং টেবিলের পাশে রাখা বুল ওয়ার্কার বলে একটা সরঞ্জামের দিকে। খবরের কাগজে তখন শরীরচর্চার সহযোগী বুল ওয়ার্কার-এর খুব বিজ্ঞাপন বেরত। জিনিসটা নিজের চোখে দেখার খুব ইচ্ছে ছিল। সেটা জানাতেই মতিদা টেবিলের পাশ থেকে বুল ওয়ার্কার বের করে আনলেন। তারপর সেটা নিয়ে খালি গায়ে আমাকে নানা ধরনের ব্যায়াম দেখাতে লাগলেন। পেশির বহর দেখে প্রথম দর্শনেই আমার মনে হয়েছিল, মতিদার কলমটাই শুধু শক্তিশালী নয়, উনি শারীরিক দিক থেকেও যথেষ্ট বলশালী।

পঁচিশ নম্বর তারক চ্যাটার্জি লেনের সামনে দাঁড়িয়ে আছি। ঘাড় উঁচু করে তিনতলার ওই চিলেকোঠার দিকে একবার তাকালাম। আগে চিলেকোঠার ছাদটা ঢালু ছিল। সংস্কার করে এখন সেটা সোজা। গলিটা খুব বেশি বদলায়নি। দু'টি বাঁকে ছোট্ট দু'টি দোকান গজিয়েছে, আর বেড়েছে পাড়ায় ক্লাবের সংখ্যা।



এক বাড়ির উঠোন সেই কিন্তু মিশে রয়েছে অন্য বাড়ির সঙ্গে। জলের কলের সামনে বালতির লাইন। চায়ের দোকানে পাড়ার ছেলেদের গুলতানি। গোষ্ঠ পালের বাড়ির নীচে, ফুটবলের বদলে আলোচনা হচ্ছে ভারত-শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট ম্যাচ নিয়ে। মতিদা বলতেন, 'ভাল লেখার জন্য চোখ চাই, চোখ।' সেই চোখেই দেখার চেষ্টা করছি তারক চ্যাটার্জি লেন-কে। মতিদার উপন্যাস 'নায়কের প্রবেশ ও প্রস্থান'-এ একটা গলির বর্ণনা পড়েছিলাম। জয়রাম মিত্র লেন। সেই গলিটার বিবরণ এইরকম : 'জয়রাম মিত্র লেনের এক থেকে ত্রিশ নম্বর পর্যন্ত চুয়াত্তরটি বাড়ির রঙই পাণ্ডুর, কলিচটা। প্রায় দু'শোটি উনুনের আঁচ পড়ে প্রতি ভোরে। অধিকাংশ বাড়ির পলেস্তারা খসে জিরজির ইট বেরিয়ে পড়েছে। এই গলিতে ভোটার সংখ্যা সাতশো, খবরের কাগজ রাখে বত্রিশটি, বছরে বিয়ে হয় তিনটি, শ্রাদ্ধ তিনটি, অন্নপ্রাশনও তিনটি। সাতটি আস্তাকুঁড়, একটি টিউবওয়েল, রাস্তায় আটটি ইলেকট্রিক বাতি, একটা খাটাল, একটা পাঠশালা, গুটি পঞ্চাশ রেডিওর শব্দ এবং কমপক্ষে আড়াইশো শিশুর চিৎকার জয়রাম মিত্র লেন দিয়ে হেঁটে গেলে চোখে বা কানে আসবে।' দাঁড়িয়ে থাকার সময় মনে হল, ওই জয়রাম মিত্র লেনটা কি আসলে তারক চ্যাটার্জি লেন? মিল আছে, অসম্ভব মিল আছে। কিন্তু আমার দেখার সেই চোখ কই? একমাত্র মতিদার মতো লেখকই পারেন, একটা গলির বর্ণনার মধ্যে দিয়ে, বাসিন্দাদের জীবনযুদ্ধের ছবিটা নিখুঁতভাবে তুলে ধরতে।

গলি দিয়ে পশ্চিমদিকে হাঁটছি। মনে পড়ল, কোথাও একটা সাক্ষাৎকারে মতিদা নাকি বলেছেন, তাঁর সেরা লেখা 'কোনি'। '৭৫-এ ওই উপন্যাসটা বেরনোর সময় আমাদের সবার ধারণা হয়েছিল, 'কোনি' আসলে বাংলার সাঁতারু বুলা নাথ কিংবা ইলা পাল। 'কোনি'-র মতো এঁরাও ছিলেন দরিদ্র পরিবারের মেয়ে। তখন আনন্দবাজার-এ প্রতি মঙ্গলবার 'মাঠ ময়দান' বলে খেলার

একটা পাতা বেরত। সেখানে বুলা আর ইলা সম্পর্কে বিরাট দু'টো লেখা লিখেছিলেন সাংবাদিক চিত্ত বিশ্বাস ওরফে চিরঞ্জীব। ওই লেখা পড়েই আমরা নিশ্চিত ছিলাম, মাদ্রাজে জাতীয় সুইমিংয়ের রিপোর্ট করতে গিয়ে চরিত্রগুলো কাছ থেকে দেখেছিলেন মতিদা। তাই ওইরকম অনবদ্য উপন্যাস লিখতে পেরেছেন। 'কোনি'-র কোচ ক্ষিদ্দা-র চরিত্র, আসলে ন্যাশনাল সুইমিং অ্যাসোসিয়েশন-এর কোচ কে পি সরকার। আমরা জানতাম, কে পি-কে খুব পছন্দ করেন মতিদা। বহুবার জানতে চেয়েছি, কার ছায়া আছে, ওই চরিত্র দু'টিতে? মতিদা কিন্তু উত্তর দেননি। বলতেন, 'সেরকম পার্টিকুলার কারও ছায়া নেই। কোনি লেখার আগে বেশ কয়েকজন বিদেশি সাঁতারুর জীবনী পড়েছিলাম। এখানে হেদুয়া বা কলেজ স্কোয়ারে ক্লাবগুলোর মধ্যে যে-ধরনের রাজনীতি হয়, তা তো চোখের সামনে দেখেছি। আসলে অভিজ্ঞতা থেকেই লেখাটা তখন লিখেছিলাম।' 'কোনি' নামটা অবশ্য মতিদা নিয়েছিলেন জার্মান সাঁতারু কর্নেলিয়া এনডার-এর নাম থেকে। কর্নেলিয়ার ডাক নাম ছিল 'কোনি'। পরে এই উপন্যাসটা নিয়ে সিনেমা করেন পরিচালক সরোজ দে। রিলিজ হওয়ার আগে টালিগঞ্জের কোনও এক স্টুডিওতে বিশেষ কিছু লোককে ছবিটা দেখানো হয়েছিল। মতিদার সঙ্গে আমিও ছবিটা দেখতে গেছিলাম। ফেরার সময় দেখলাম, উনি পুরো সন্তুষ্ট নন। অনেক ভুল বের করেছিলেন। মতিদার মতো লোকেরা এমন খুঁতখুঁতে, চট করে খুশি করা সম্ভব না। জানি না, ছবিতে সেই ত্রুটিগুলো পরে শোধরানো হয়েছিল কি না। হঠাৎই মনে হল, 'কোনি' ছবিটা কি তারক চ্যাটার্জি লেনের আরেক রত্ন আরতি সাহা দেখেছিলেন? দেখলে, তখন কী বলেছিলেন?

গলি দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বি কে পাল অ্যাভেনিউ-তে চলে গিয়েছিলাম। গোপী সেন লেন দিয়ে ফের এসে ঢুকলাম তারক চ্যাটার্জি লেন-এ। উত্তর কলকাতার এই সব গলি এবং তার বাসিন্দারাই তো ঘুরে-ফিরে এসেছে মতিদার বিভিন্ন উপন্যাসে। যেমন 'স্ট্রাইকার' উপন্যাসের প্রসূন। জানার খুব কৌতূহল ছিল, আসলে এই প্রসূনটা কে? সত্তরের দশকের গোড়ায় অসীম মৌলিক নামে এক ফুটবলার মাঠ কাঁপাতেন। তিনি থাকতেন মতিদার বাড়ি থেকে আধ কিলোমিটার দূরে রাজবল্লভ পাড়ায়। তাঁর সম্পর্কে 'মাঠ ময়দান'-এ একটা লেখা লিখেছিলেন চিত্তদা। অসীম তখন চাকরি করতেন রেলের লিলুয়া ওয়ার্কশপ-এ। ফিরে এসে চিত্তদা গল্প করেছিলেন, 'ইন্টারভিউ নেওয়ার জন্য ওখানে গিয়ে দেখি, ফোর্থ ক্লাস স্টাফের ড্রেস গায়ে চাপিয়ে, অসীম মইয়ে উঠে মাইকের চোঙ পরিষ্কার করছে। শুনে মতিদা খুব আগ্রহ দেখান। নিজেও বেশ কয়েকবার কথা বলেন অসীমের সঙ্গে। তার পরের বছরেই লেখেন স্ট্রাইকার।' অসীম মৌলিক এখন আর বেঁচে নেই। হয়তো উনিই বলতে পারতেন, ওঁর সঙ্গে কতটা মিল ছিল প্রসূনের।

আঠারো-উনিশ বছর আগে একদিন আনন্দবাজার-এর স্পোর্টস ডিপার্টমেন্টে বসে আছি আমি আর মতিদা। সেদিনই খবর এসেছে, 'সাদা খাম' উপন্যাসটির জন্য উনি সাহিত্য অ্যাকাডেমি পুরস্কার পেয়েছেন। মতিদা বেশ খুশি। সাহস করে হঠাৎই প্রশ্নটা করে ফেলেছিলাম, 'আপনার প্রায় সব লেখাতেই উত্তর কলকাতার অলিগলি আর তার মানুষজন ঘুরে ফিরে আসে। তার বাইরে লেখার রসদ কি আপনি খুঁজে পাননি?' অন্য কোনওদিন হলে, মতিদা ধমক দিয়েই আমাকে চুপ করিয়ে দিতেন, 'তাতে তোমার কী?' কিন্তু সেদিনটার কথা আলাদা। মতিদা স্নেহচ্ছলেই আমাকে বোঝাতে লাগলেন, 'কেন জানো? জীবনের প্রায় পঞ্চাশটা বছর আমি কাটিয়েছি উত্তর কলকাতার গলিতেই। ওতেই আমি সড়গড়। ওই গলির চরিত্রগুলোকে আমি কাছ থেকে দেখেছি। ওদের নিয়ে লিখতে বসলেই দেখেছি, বেরিয়ে আসে এমন একটা গল্প, যাতে আছে আমার অনুভূতি আর স্পন্দন। চরিত্রগুলো যতক্ষণ না জমাট বাঁধছে, গল্পটার উদ্দেশ্য বা লেখার ধাঁচ সম্পর্কে আমার একটা ধারণা তৈরি হচ্ছে, ততক্ষণ লেখায় হাত দিই না। কী ঘটবে, সে সম্পর্কে একটা প্রাথমিক ধারণা তো থাকেই। হয়তো সেটা একটা সাধারণ ঘটনা। নিজে দেখেছি, অথবা কারও কাছ থেকে শোনা। সেটাই মনের মধ্যে ঘুরতে থাকে। ভাবি, এই ঘটনাটাই যদি তারক চ্যাটার্জি লেন-এ ঘটত, তা হলে আমার দেখা চরিত্রগুলো কীভাবে রি-অ্যাক্ট করত? এটা ভাবলেই লেখা তরতর করে এগিয়ে যায়। আমার চেনা পরিবৃত্তের মধ্যে অসংখ্য চরিত্র দেখেছি। তাদের মধ্যে অনেকে এখনও আমার লেখায় আসেনি। ফলে আমাকে কখনও বাইরে বেরনোর কথা ভাবতে হয়নি।'

লেখক-জীবনের পঞ্চাশ বছরে মতিদা বড়দের উপন্যাস লিখেছেন মাত্র বত্রিশটি। আর কিশোরদের জন্য উপন্যাস বাইশটি। সমবয়সি ঔপন্যাসিকদের তুলনায় অনেক কম। তাঁদের কেউ-কেউ তিনশোর বেশি উপন্যাস লিখে ফেলেছেন। মতিদার কেন এত কম? অনেকে বলেন, মতিদা হলেন লেখকদের লেখক। ওঁর পাঠকসংখ্যা কম। বইয়ের কাটতি কম। একজন লেখক অবশ্য লিখতে বসে আগে কাটতির কথা ভাবেন না। তবুও উত্তরটা আমি পেয়ে গিয়েছিলাম। মনে আছে, আনন্দবাজার-এর ক্রীড়া দপ্তরে একদিন কী একটা কাজে মতিদার কাছে এসেছেন লেখক আবুল বাশার। 'ফুলবউ' লিখে রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে গেছেন বাশার সেই সময়। লেখালেখি নিয়ে দুই সাহিত্যিক কথা বলছেন। আমি চুপ করে শুনছি। মতিদা বললেন, 'ভাল কিছু লিখতে হলে একটা লেখা বারবার লেখা দরকার। এ ব্যাপারে আমি বঙ্কিমচন্দ্রকে ফলো করি। উনি বলেছিলেন, যা লিখবেন, তা হঠাৎ ছাপাবেন না। কিছুকাল ফেলে রাখবেন। কিছুকাল পরে সেটা সংশোধন করবেন। দেখবেন, নানা ভুলত্রুটি আছে। আমিও একটা লেখা ছাপতে দেওয়ার আগে বারবার লিখি। এতে আমার লেখার সংখ্যা কমে যায়। তাতে কিছু আসে যায় না।' শুনে বাশার খুব উৎসাহিত। বললেন, 'ঠিক বলেছেন মতিদা। সাগরদার (সাগরময় ঘোষ) কাছে ফুলবউ-এর পাণ্ডুলিপি পাঠানোর আগে, পুরো উপন্যাসটা আমি পাঁচবার রি-রাইট করেছিলাম।' আনন্দবাজার-এ নামী বহু লেখককে কাছ থেকে দেখেছি। এমন লেখকও দেখেছি, রাতের ডিউটির ব্যস্ততার ফাঁকে, যিনি তাঁর ধারাবাহিক উপন্যাসের কিস্তি লিখে যাচ্ছেন। এঁদের সঙ্গে মতিদাকে কখনও আমি মেলাতে পারিনি।

মনে আছে, সত্তরের দশকের মাঝামাঝি নামী এক প্রকাশক এসেছেন মতিদার কাছে। পুজোসংখ্যায় উপন্যাস লেখার অনুরোধ নিয়ে। মাঠ থেকে ফিরে এসে আমি তখন ম্যাচ রিপোর্ট করছি। হঠাৎ সেই প্রকাশককে মতিদা বললেন, 'এই ছেলেটাকে দেখছেন, এর নাম রূপক। একে লিখতে বলুন। এ ভাল লিখতে পারবে।' ভাবলাম, মতিদা ঠাট্টা করছেন বোধহয়। জীবনে তখন একটা গল্পও লিখিনি। উপন্যাস তো দূর অস্ত। লজ্জায় মুখ নীচু করে রয়েছি। আমাকে বাঁচিয়ে দিলেন সেই প্রকাশক। মতিদার কথায় গুরুত্ব না দিয়ে উনি অন্য প্রসঙ্গে চলে গেলেন। তার কুড়ি বছর পর সত্যি-সত্যিই পুজো সংখ্যায় আমার 'জুয়াড়ি' উপন্যাসটা বেরল। পাঠকদের প্রতিক্রিয়া শুনে মনে হল, কোনওরকমে উতরে গিয়েছি। কোনও একটা লেখা বেরনোর পরই, সেটা খেলার লেখা হোক বা অন্য কিছু, প্রথমেই আমার মনে হত, লেখাটা পড়ে মতিদা কী বলবেন। অন্যরা যতই ভাল বলুক না কেন, ওঁর মুখ থেকে না-শোনা পর্যন্ত আমার শান্তি হত না। বিজয়ার প্রণাম করতে সেবার মতিদার বাড়ি গিয়েছি, আশা করে, ভাল-মন্দ উনি একটা কিছু বলবেন। আশ্চর্য, সেদিন উনি কিন্তু একটা কথাও বললেন না। আমাকে দেখে কে যেন বলতে যাচ্ছিলেন, 'রূপক, তোমার লেখাটা...'। কিন্তু তাঁর দিকে মতিদা এমন কড়াভাবে তাকালেন যে, তিনি কথাটা শেষ করতেই পারলেন না। ভীষণ অভিমান হয়েছিল সেদিন। বলতে গেলে, চোখে জল নিয়েই আমি মতিদার বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছিলাম।

কিন্তু মতিদার ছাত্ররাও যে মতিদার মতোই একগুঁয়ে! ঠিক



ছবি : তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়



ছবি : তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

করে নিয়েছিলাম, লেখা নিয়ে আমি কোনওদিন কোনও কথা জানতে চাইব না। আমার তৃতীয় উপন্যাস বেরল, 'লাল রঙের পৃথিবী'। তারক চ্যাটার্জি লেনের কাছেই সোনাগাছি পাড়ার মেয়েদের নিয়ে লেখা। সেবার বিজয়ার প্রণাম করতে গিয়েছি। হঠাৎ মতিদা বললেন, 'তোমার লেখা পড়েছি। ওই লেখাটা তো আমার লেখার কথা। এত কাছে থাকতাম। আমারই উচিত ছিল, ওদের নিয়ে বড় কিছু লেখা।' মুখে প্রশ্রয়ের হাসি। সঙ্গে-সঙ্গে আমার অভিমান জল হয়ে গেছিল। ওই মুখটা দেখে মনে হয়েছিল, আরে ইনিই তো আসল মতিদা। প্রশংসা করে যিনি কোনওদিন মাথা ঘুরিয়ে দেননি। লেখা নিয়ে আত্মতুষ্টির কোনও অবকাশ দেননি। সবসময় এমন একটা ভঙ্গি করেছেন, লেখাটা আরও ভাল হতে পারত। তিনটে উপন্যাস বেরনোর পরই আমি বুঝতে পারছিলাম, সাহিত্যজগৎটা আর যা-ই হোক, খেলার জগৎ নয়। অনেকেই আমাকে ডকুনেচার সাহিত্যিকের তকমা দিতে ব্যস্ত। কথার কথায় সেটা বলে ফেলেছিলাম মতিদার কাছে। উনি বললেন, 'কে কী বলল, তা নিয়ে মাথা ঘামিও না। যে ধরনের লেখা তোমার লিখতে ভাল লাগে, যেটা তুমি পারো, সেটাই লিখে যাও। অন্যের সার্টিফিকেট পাওয়ার আশায় নিজের স্টাইল বদলাবে না। আমি কখনও বদলাইনি। লেগওয়ার্ক করো। অভিজ্ঞতার ঝুলি বাড়াও। টেবিলে বসে ভাল লেখা হয় না।'

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা পড়তে বলতেন মতিদা। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের করিতাও। শক্তিদা ছিলেন মোহনবাগানের অন্ধ সমর্থক। সময় পেলেই ময়দানে খেলা দেখতে যেতেন। দেখা হলে, প্রায় দিনই আমার ওপর চোটপাট করতেন। ওঁর ধারণা, আমি ইস্টবেঙ্গলের সাপোর্টার। ক্রীড়া দফতরে এসে শক্তিদা প্রায়ই বলতেন, 'এই মতিলাল, তোর এই শিষ্যটা কিন্তু খুব বাড়াবাড়ি করছে। সবসময় আমাদের টিমের এগেনস্টে লেখে।' শুনে মতিদা হাসতেন। তখন আমি ঠিক বুঝতে পারতাম না, মতিদা কোন দলের। দু'জনেই উত্তর কলকাতার। মোহনবাগান সাপোর্টার হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু সবুজ-মেরুন টিমের বিরুদ্ধে কোনও কিছু লিখলে উনি আমাকে বাধা দিতেন না। বড় ম্যাচ নিয়ে আনন্দবাজারএ একবার হেডিং হয়েছিল, 'ইস্টবেঙ্গল খেলেছে, মোহনবাগান জিতেছে।' সেদিনই মোহনবাগানের উগ্র সমর্থকরা হাজির হয়েছিলেন তারক চ্যাটার্জি লেনে। সেদিনই বুঝেছিলাম, ক্লাবের জার্সি গায়ে চাপানো সংবাদিকের উচিত না। অবসর নেওয়ার পর অসুস্থতার জন্য লেখালেখি থেকে সরে আসেন মতিদা। হাত চলত না। হাতের লেখাও খারাপ হয়ে গেছিল। কিন্তু চোখটা ঠিক ছিল। নিয়মিত খেলা দেখতেন টিভি-তে। শুনলাম, মারা যাওয়ার দু'দিন আগেও নার্সিং হোমে শুয়ে এবারের ফেডারেশন কাপ সেমিফাইনাল ম্যাচটা দেখেছেন ডাক্তারের সঙ্গে বসে। ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানের সেই টেনশনের ম্যাচ। ইস্টবেঙ্গল সমর্থক ডাক্তারকে মতিদা সেদিন বলেছিলেন, মোহনবাগান জিতবে। কিন্তু প্রিয় টিমের হেরে যাওয়াটা তিনি ভালভাবে নিতে পারেননি। রাতের দিকে অসুস্থ হয়ে পড়েন।

তারক চ্যাটার্জি লেন থেকে বেরিয়ে আসছি। হঠাৎই একটা কথা মনে পড়ল। মতিদা তখন বোধহয় বক্সারকে নিয়ে 'শিবার ফিরে আসা' উপন্যাসটা লিখছেন। আমাকে বললেন, 'সত্যিকারের চ্যাম্পিয়ন কে জানো?' উত্তরের আশায় চুপ করে রইলাম। মতিদা নিজেই উত্তরটা দিলেন, 'চ্যাম্পিয়ন হল সে, যে নক আউট হতে হতেও, রিং-এ পড়ে যাওয়ার আগে, শরীরের সব এনার্জি জড়ো করে, উঠে দাঁড়িয়ে পাল্টা ঘুসি মারতে পারে।' বড় রাস্তায় এসে, হঠাৎ মনে হল, আরে চ্যাম্পিয়ন মানুষটা তো এতদিন ছিলেন আমাদের চোখের সামনে। মতি আর লিখতে পারছেন না। মতির হাত আর চলছে না। নক আউট প্রায় হয়েই গেছিলেন মতিদা। কিন্তু ঠিক সেই সময় লিখে ফেললেন অসাধারণ একটা উপন্যাস। 'বিজলীবালার মুক্তি।' ওই একটা পাঞ্চ তখন দরকার ছিল।

ব্যতিক্রমী মানুষদের মূল্যায়ন হয় মৃত্যুর পর। মতিদার মূল্যায়ন শুরু হয়ে গেল।


পূর্বভারতের সর্ববৃহৎ ডায়াবেটিস এবং মাল্টিস্পেশালিটি হাসপাতাল
সমস্ত রোগমুক্তির নতুন ঠিকানা
প্রতিশ্রুতি বিশ্বমানের পরিষেবা
একই ছাদের নীচে সব রোগের নিরাময়
যে-কোনো অসুখে, ১০০ টাকায়
বিশেষজ্ঞদের বিশদ পরামর্শ
(সকাল ৮ থেকে দুপুর ২)
সেরা সি. টি. অ্যাঞ্জিও মেশিনের সার্বিক
সুবিধাযুক্ত অত্যাধুনিক প্যাথোলজি
(রিপোর্ট ২৪ ঘণ্টার মধ্যে)
দিনরাত অবিরত ইমারজেন্সি, সবসময় ফার্মাসি
স্পেশালিটি ক্লিনিক্স- ডায়াবেটিস, হার্ট, অ্যাজমা,
চক্ষু পরীক্ষা সহ সামগ্রিক চিকিৎসা
রেডিয়োলজি, ইমেজিং পরিসেবা, সি টি স্ক্যান
কালার ডপলার, এম আর আই সহ
আধুনিক স্ক্যাবরেটরির পরিষেবা
কর্পোরেট, সিনিয়র সিটিজেন এবং
সন্নিহিত প্রতিবেশীদের জন্য বিশেষ সুবিধা
অঙ্গীকার সেবার আদর্শ, কম খরচে ভালো চিকিৎসা।
Care for Life
আপনার সুস্বাস্থ্য
আমাদের অঙ্গীকার
জি ডি ডায়াবেটিস ইনস্টিটিউট অ্যান্ড স্পেশালিটি ক্লিনিক্স প্রা. লি.
১৫০ শয্যা এবং বহুমুখী পরিষেবা বিশিষ্ট অত্যাধুনিক হাসপাতাল
১৩৯এ লেনিন সরণি, কলকাতা ৭০০ ০১৩ ফোনঃ ০৩৩-২২২৫৫০৩০/৩১/৩২/৩৩
ফ্যাক্সঃ ০৩৩-২২২৫১১১৫ E-mail: gddi502@gmail.com, gddi502@bsnl.com

অপরাজিত আনন্দ ▲ অরুণ সেনগুপ্ত

বাংলার নেভিল কার্ডাস

মতি নন্দী খেলাটাকে দেখতেন ক্রীড়াপ্রেমীর চোখ চোখ দিয়ে, বিশ্লেষণ করতেন সাংবাদিক সত্তা দিয়ে, আর বর্ণনা করতেন তাঁর সাহিত্যের ভাষায়। আনন্দবাজার-এর 'মাঠ ময়দান' ক্রোড়পত্র সম্পাদনা করে চার কিস্তিতে নিয়ে গেলেন জনপ্রিয়তার তুঙ্গে।

'হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি। কিন্তু কেন আসতে চাইছ?'

বললাম। এবার টেলিফোনের অপর প্রান্তের কণ্ঠস্বরে শুধুই বিরক্তি, 'না না, কোনও দরকার নেই। এতদিন কোথায় ছিলে? একবারও খোঁজ নিয়েছ, মানুষটা বেঁচে আছে না মরে গেছে? লেখা চাইতে লজ্জা করে না? জানোই না যে আমি এখন আর লিখতে পারি না।'

'না' শব্দটা ওঁদের অভিধানে কখনও ছিল না। বিশেষ করে অশোকদা, হয়নি-পারিনি শুনলেই রেগে যেতেন। ক্রীড়া সাংবাদিকতার হাতেখড়ি অবস্থা থেকেই অশোক দাশগুপ্ত, সরোজ চক্রবর্তীর কাছে বড় হয়েছি। জানি, সকালে গিয়ে না-পেলে রাতে যেতে হবে। রাতে না পেলে ভোর রাতে। কাউকে ধরতে চাইলে যেভাবেই হোক ধরতে হবে। খবর তুলতে হবে। এটাই অভ্যেস হয়ে গিয়েছে। এই অভ্যেস থেকেই কবে কখন কে জানে, জন্ম নিয়েছে জেদ। বিশেষ করে উল্টোদিক থেকে 'না' শুনলে রোখ চেপে যায়।

সেরকমই হল মতি নন্দীর সঙ্গে কথা বলে। আজকাল-এর 'খেলা' ম্যাগাজিনের এক অনুষ্ঠানে মতিদার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল সম্ভবত সরোজদাই। 'আমাদের রিপোর্টার, খুব ভাল কাজ করছে'—আমার সম্পর্কে এই ধরনের কিছু কথা বলেছিল সরোজদা। মতিদা, 'ও আচ্ছা'-র বেশি এগোননি। সেই অর্থে মতিদার সঙ্গে আমার কখনও কথা হয়নি। ওটাই প্রথম, টেলিফোনে।

সেবার ঠিক হল, সংবাদ প্রতিদিন-এর বন্ধ হয়ে যাওয়া বৃহস্পতিবারের ক্রোড়পত্র 'খেলার দুনিয়া' ম্যাগাজিন আকারে শারদীয়া সংখ্যা হয়ে বেরোবে। অশোক দাশগুপ্ত লিখেছিলেন, ক্রীড়া সাংবাদিকতার তিন স্তম্ভ : মুকুল দত্ত, অজয় বসু ও মতি



নন্দী। প্রথম দু'জন প্রয়াত। মতি নন্দী আছেন। খেলার দুনিয়া-র প্রথম শারদীয়া সংখ্যায় সেই স্তম্ভ থাকবেন না? কোনও খেলা পত্রিকার শারদীয় সংখ্যায় তিনি কখনও লেখেননি। সেদিন থেকেই চেষ্টা শুরু হয়ে গেল। এবং, শেষ পর্যন্ত মতিদা তাঁর বাড়িতে আসার অনুমতি দিলেন।

টেলিফোনে সেদিন যেরকম কড়া-কড়া কথা বলেছিলেন, বাড়িতে ততটা নয়। প্রথম দিন আমার সঙ্গে ছিল সহকর্মী দীপক পাত্র। দরজা খুলে যিনি আমাদের ভিতরে এসে বসতে বললেন, তিনি মতিদার মেয়ে। মতিদা এলেন কিছুক্ষণ পরে। আমরা প্রণাম করে সঙ্গে আনা মিষ্টির প্যাকেটটা এগিয়ে দিলাম। মতিদা বললেন, 'আমার সুগার, মিষ্টি খাই না। ওটা নিয়ে যাও।' জানতে চাইলাম, ঠিক কী হয়েছিল? মতিদা জানালেন, খুবই কষ্টের মধ্যে কেটেছে বেশ কয়েকটা দিন। নার্সিং হোমে ভর্তি হয়েছিলেন। ফিরে আসার পরেও অনেকগুলি সমস্যা থেকে গিয়েছে। 'সব থেকে বেশি অসুবিধা করছে পা দু'টো। একদম হাঁটতে পারছি না। দাঁড়িয়ে থাকতেও কষ্ট হয়। কেমন যেন অসাড়। বেশিক্ষণ কথা বলতেও কষ্ট।' জানতে চাইলেন, আমরা কী চাই। বললেন, 'আমি কিন্তু লিখতে পারব না, হাত কাঁপে।' বললাম, 'লেখাটা আমি করব। আপনি বলবেন। লেখা হয়ে গেলে দেখে দেবেন।' মতিদা বললেন, 'সেটা তো আমার লেখা হবে না। তোমার লেখা অথচ আমার নামে! আমি 'ডিকটেশন'ও দিতে পারব না। ঠিক আছে, লেখাটা হোক। নীচে বড় বড় করে অনুলিখনে তোমার নাম দিতে হবে।' তাতেই রাজি হয়ে গেলাম। উঠে আসার সময় মিষ্টির প্যাকেটটা দেখিয়ে বললাম, 'এটা থাক, বাড়ির লোকজন তো আছে।' মতিদা আপত্তি করলেন না।



পরের দিন নোটবইয়ের সঙ্গে একটা টেপ রেকর্ডারও নিলাম, যাতে কোনও পয়েন্ট মিস না হয়। মতিদা বলতে শুরু করলেন তাঁর জীবনের কথা। ছোটবেলার কথা। যখন বাবা মারা যান, তখন তাঁর বয়স মাত্র সতেরো মাস। পাঁচ ভাইবোনের মধ্যে তিনিই সব থেকে ছোট। ১৯৪৮-এ স্কটিশচার্চ স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাস, বিদ্যাসাগর কলেজে আইএসসি। তারপর টেকনিক্যাল স্কুল থেকে অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপ্লোমা শেষ করে স্টেট ট্রান্সপোর্ট বেলঘরিয়া ডিপো-য় আনপেড অ্যাপ্রেন্টিস হিসাবে কাজ করা। মতিদার এটাই প্রথম জীবন।

ছোটবেলা থেকেই খেলাধুলো ভালবাসতেন। ফুটবল, ক্রিকেট—দু'টোই খেলতেন। বিশ্বাস করতেন, খেলা আর খেলোয়াড়দের ভালবাসতে না-পারলে ক্রীড়া সাংবাদিকতা হয় না। আনন্দবাজার-এর সেই সময়কার নিউজ এডিটর সন্তোষকুমার ঘোষের সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন সমরেশ বসু। পত্রিকার সার্কুলেশন বাড়াতে কয়েকটি পদক্ষেপ নিয়েছিলেন সন্তোষবাবু। তারই একটি ছিল খেলা নিয়ে ক্রোড়পত্র। এই ক্রোড়পত্রের দায়িত্ব দিয়েছিলেন মতি নন্দীকে। শর্ত ছিল, পাতাটি করতে পত্রিকার ক্রীড়াদপ্তরের সাহায্য নেওয়া যাবে না। দায়িত্ব পেয়ে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন মতি নন্দী। নিজেই লিখতেন সব লেখা। এক নামে এতগুলি লেখা দেখতে ভাল লাগে না বলে একটা ছদ্মনাম নিলেন, কালকেতু। ময়দান চষে, লাইব্রেরিতে সময় দিয়ে, প্রচুর পরিশ্রম করে দাঁড় করিয়ে দিলেন 'মাঠ ময়দান'।

পনেরো দিনে একদিন বেরুত পাতাটি। দু'মাসে জনপ্রিয়তার এমন জায়গায় পৌঁছল যে সাপ্তাহিক করে দিলেন সন্তোষবাবু। 'মাঠ ময়দান' করতে করতেই তাঁর ক্রীড়া সম্পাদক হওয়া। তারপর তো ইতিহাস। সব খেলাতেই ছিল তাঁর সমান বিচরণ। খেলাকে উপজীব্য করে ভারতীয় সাহিত্যে নতুন একটি ধারায় প্রথম সার্থক গল্প-উপন্যাস লিখেছিলেন যে মানুষটি, তিনিই আবার বাংলা খবরের কাগজের খেলার পাতাকে নতুন চেহারায় সাজিয়ে দিলেন, তার একঘেয়েমি কাটিয়ে স্থবিরতা ঘুচিয়ে রসকষহীন শুকনো পাতাকে সরস করে। মতি নন্দী খেলাটাকে দেখতেন ক্রীড়াপ্রেমীর চোখ দিয়ে, বিশ্লেষণ করতেন সাংবাদিক সত্তা দিয়ে, আর বর্ণনা করতেন তাঁর সাহিত্যের ভাষায়। সেই জন্যই তাঁকে বলা হত বাংলার 'নেভিল কার্ডাস'। নোট নিচ্ছিলাম আর ভাবছিলাম, আরও কয়েকদিন আগে এইভাবে যদি মানুষটার সান্নিধ্যে আসা যেত, কী উপকারটাই না হত।

একটা করে পার্ট লিখেছি, অসুস্থ শরীর নিয়ে মতিদা 'কারেকশন' করেছেন। শব্দ বদলেছেন, আগে-পরে করেছেন। এবং কেন করছেন, পরদিন সেটা বুঝিয়ে দিয়ে বলেছেন, 'পরের পার্টে সতর্ক থেকো।' লেখাটি শেষ হওয়ার পর পুরোটা আবার পড়ে ভূমিকায় কাঁপা কাঁপা হাতে নিজেই লিখে দিলেন, তিনি বলেছেন আমি টুকেছি।

তারপরেও মতিদার বাড়িতে গিয়েছি। কথা হয়েছে। আলোচনা হয়েছে পুজোসংখ্যায় প্রকাশিত 'মনে পড়ে'-কে বই করা নিয়ে। মতিদা বলেছিলেন, 'নিজেকে নিয়ে এত কথা আমি কোথাও কখনও লিখিনি, 'মনে পড়ে'তে যা আছে। বইয়ের জন্য আরও একটু বাড়াতে হবে। মনে করতে হবে, দিতে হবে আরও ঘটনা।' উৎসাহ নিয়ে বলেছিলাম, আপনি বলবেন, আমি টুকব। আর বইটা আমাদের প্রকাশনা থেকে প্রকাশিত হবে।

তা আর হল কোথায়! আমাদের জন্য আর কয়েকটা বছর থাকা যেত না? ঊনআশি বছর চলে যাওয়ার মতো বয়েস হল, এই যুগে?

ছবি : তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

অপরাজিত আনন্দ ▲ দেব রায়

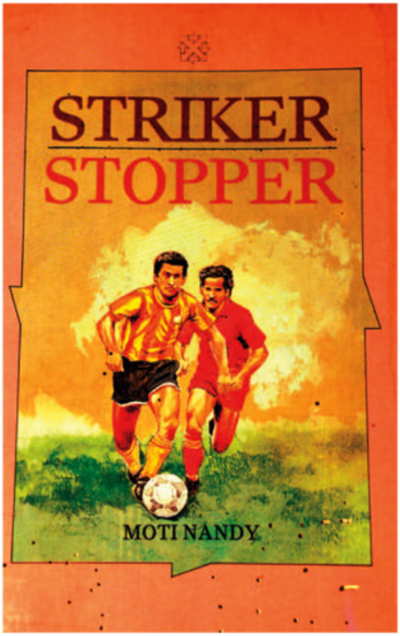
ফাইট, পাঠক, ফাইট

সব অনটন প্রতিকূলতা কাটিয়ে, লাস্ট ল্যাপে জিতে যাবে আন্ডারডগ, প্রমাণিত হবে, মানুষকে হারানো যায়, কিন্তু ধ্বংস করা যায় না। তার ঘুরে দাঁড়ানোর আগুন বোনা থাকে মতি নন্দীর লেখায়। ছড়িয়ে যায়।

সে এক সময় ছিল। ইস্কুল-ফেরত খেলার মাঠের দিকে একছুট ছিল। লাল-লাল মিষ্টি-মিষ্টি বুড়ির চুল আর 'বদলে বিস্কুট' ছিল। তখন শট বলতে প্লাস্টিক, গোলকি মাত্রই চোম্বুক। ফস্কে যাওয়া ট্রাইবেকার-এর উত্তেজনায় ঘুমের মধ্যে নিশপিশ করত পা, লাথি পড়ত পাশে শোওয়া দাদার গায়ে। তখন রংচটা টি-বল ছিল, তার ব্লাডার ছিল। সাইকেল সারাই-এর দোকান থেকে পাম্পার চেয়ে সেই ব্লাডার ফুলিয়ে লেসিং কল দিয়ে মুখ এঁটে গ্রিজ মাখিয়ে ফুটবলকে দুরন্ত করার অশেষ যত্ন ছিল। খেলতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে পড়ে নুনছাল উঠে গেলে কনুইকে ট্রফির মতো উঁচু করে বাড়ি ফিরলে অশেষ দুঃখ ছিল, আর ছিল সর্বরোগহর বোরোলিন এবং আর্নিকা। স্লিপ-এ দাঁড়িয়ে ড্রাইভ দিয়ে ক্যাম্বিস বলের ক্যাচ লুফতে পারলে নিজেকে মনে হত ভিক্টিস্ট্যান্ড-এ (ইস্কুল স্পোর্টস-এর এক-দুই-তিন লেখা কাঠের বাক্স) দাঁড়ানো চাম্পিয়ন। তখন জয়দ্রথ পালায় 'হ্যাঁ' ছিল আর বিনাকা গীতমালায় 'না' ছিল। আর ছিল মতি নন্দী।

তখন জাস্ট ঠিক করেছি বৈজ্ঞানিক আর নাবিকটা হব না, ডিটেকটিভ দল খুলব। সেই মতো বাপি, মণির সঙ্গে কথাও হয়ে গিয়েছে। ভেস্তে দিল রাঙামামা। ডাক্তারি পড়ার ফাঁকে ছুটিতে জানাল সত্যিকারের রিভলবার-এর জন্য লাইসেন্স লাগে আর সেটা ছোটদের দেওয়া হয় না। ব্যস, ডিটেকটিভ ক্যানসেল। রিভলবারই যদি না থাকে তো ডিটেকটিভ হয়ে লাভ কী! রবার্ট ব্লেক, দীপক চ্যাটার্জি, কিরীটী, জয়ন্ত, ফেলুদা সব্বারই রিভলবার আছে। অগত্যা পেলে, কিরমানি, শ্যাম থাপা আর শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায় হওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকল না। ঠিক এই সময় আলাপ হল অনিল ভট্টাচার্যের বড় ছেলের সঙ্গে। তার কাছে ব্রাজিলের সন্তোষ থুড়ি স্যান্টোস ক্লাবের কর্মকর্তা পরিষ্কার বাংলায় তাদের ক্লাবে খেলার জন্য বছরে দু'লক্ষ টাকার বরাত নিয়ে এসেছে। তার নাম প্রসূন, প্রসূন ভট্টাচার্য, স্ট্রাইকার। আর তার হাত ধরে আমরা ঢুকে গেলাম খেলার দুনিয়ার আশ্চর্য জগতে। আমাদের চোখের সামনে জ্যান্ত হয়ে উঠতে লাগল মাঠ-ময়দানের খুঁটিনাটি, রণ-রক্ত-সফলতা, পাতি-পলিটিক্স, বেচাকেনা, অপবাদ-বদনাম আর তীব্র লড়াই। প্রাক্-স্পনসর সেই যুগে টিউকলের জল খেয়ে, খিদে চেপে, সেই জল গায়ে লাগিয়ে, ঘেমো সেজে প্র্যাকটিসে আসা এক দঙ্গল ছেলের লড়াইয়ের কথা। পাতলা দু'পিস রুটি আর একটা ডিম খেয়ে কত আর চক্কর কাটা যায়? তাই শোভাবাজার ইউনিয়ন-এর কোচ বিপিনদাকে খুশি রাখার জন্য নকল ঘাম। আর প্রসূনের সঙ্গে সঙ্গে আমরাও বুঝতে পারি গ্যালারি-ঘেরা মাঠগুলো দূর থেকে যতটা





সবুজ মনে হয়, কাছে গেলে ততটা নয়। সেখানে অনেক চোরাগোপ্তা আক্রমণ, পাঁজরের হাড় ভেঙে দেওয়া লাথি, টপ ফর্মে গোটা সিজন সাইড লাইনে বসিয়ে রাখার বঞ্চনা, সিলেকশন কমিটি-র দাদাগিরি। তাই বলে, যে সাচ্চা লড়াকু সে কি দমে যাবে? না, সে দমবে না। আর এইখানে মতি নন্দীর খেল! কী বিশ্বাসযোগ্য ভাবে, সমস্ত অভাব অনটন প্রতিকূলতা কাটিয়ে, দুর্ধর্ষ প্রতিপক্ষের সঙ্গে টক্কর দিয়ে, নিজের দলের অন্তর্ঘাত সামলে, ইফ রেইন, ইফ নট রেইন-এর দোলাচল টপকে কীভাবে 'আন্ডারডগ' ফিনিশ করবে লাস্ট ল্যাপ, তীব্র শট কিংবা আলতো চিপ-এ বিপক্ষের নেট-সই করবে সাদা-কালো পৃথিবীটা, সে বিবরণ পড়তে গলার কাছটা আপনাআপনি ব্যথা-ব্যথা করে উঠবে, ঝাপসা হয়ে যাবে চোখ আর মনের মধ্যে হর্ষদা উস্কিয়ে দিয়ে যাবে 'ওল্ড ম্যান অ্যান্ড দ্য সি'-র স্পিরিট। মানুষকে হারানো যেতে পারে, কিন্তু ধ্বংস করা যেতে পারে না। তাই শিল্ড ফাইনালে 'যুগের যাত্রী'-র হয়ে স্ট্রাইকার প্রসূন ভট্টাচার্য 'রেঙ্গুন ইউনাটেড'-এর বিরুদ্ধে জয়সূচক গোলটা করলে, ওই 'যুগের যাত্রী' থেকে ঘুষখোর অপবাদে বিতাড়িত ফুটবলার অনিল ভট্টাচার্যর কপালের অপমানের কালশিটে-টা রাজটীকা হয়ে জ্বলতে থাকে। 'স্ট্রাইকার'-এর আর একটা দিক খুব ভাল লাগে, তা হল নীলিমার চরিত্র। ছোটদের জগৎ ছিল ঘোরতর স্ত্রী-ভূমিকা বর্জিত। প্রায় কোনও গল্পেই অল্পবয়েসি মেয়ের কোনও সিন ছিল না। একমাত্র স্বপনকুমারের এক কালনাগিনী ছিল। তা বাদে গোটাটাই পুরুষ-প্রধান। সেখানে নীলিমার মতো একটা শান্ত, মিষ্টি মেয়ের উপস্থিতি মরূদ্যানের সমান। কতবার ভেবেছি অমন একটা মেয়ে আমাকে একটু অন্য চোখে দেখুক। টিপ-বোতাম দেওয়া ছোট্ট বটুয়া খুলে আমাকেই দিক মহার্ঘ আধুলি। আমাকে বলুক, তুমি যেটা ভালবাসো সেটাই করো। সেটাই তোমার পড়াশোনা। না, থ্রি ইডিয়টস-এর কথা হচ্ছে না। কথা হচ্ছে নীলিমা আর প্রসূনের। হয়তো ঠিক এই কথাগুলোই নয়। কিন্তু মোদ্দা দাঁড়াচ্ছে, প্রসূন যে পড়াশোনা না করে বল পেটাচ্ছে,



এটাকে নীলিমা অশ্রদ্ধা করছে না, বরং উৎসাহ জোগাচ্ছে। তাই 'হয়ে ওঠা'-র গল্পটা আর শুধু একজনের জয়ী হওয়ার গল্প থাকছে না। প্রসূনের সঙ্গে থাকছে হর্ষদা, নিমাই, আনোয়ার, থাকছে বাবার অপমানের জবাব দেওয়ার দায়, ন্যাওটা ভাই পিন্টুকে না-দিয়ে নিজে খাওয়ার যন্ত্রণা, নীলিমার শুশ্রূষা-প্রশ্রয়। 'কোনি'-র তেমনি একাই একশো ক্ষিদ্দা। যেমন সাংঘাতিক টাস্ক মাস্টার, তেমনি স্নেহপরায়ণ। জহুরি যেমন না-কাটা হিরে দেখে চিনতে পারে, ঠিক তেমনি ক্ষিদ্দা চিনেছিল কোনিকে। তারপর তো বইঠা এবং পরে রেডিওতে শাঁওলি মিত্র-সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় (নহবৎ) এবং আরও কিছু পরে শ্রীপর্ণা-সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের সুবাদে বাঙালির আজ পর্যন্ত সবচেয়ে সদর্থক স্লোগান 'ফাইট, কোনি ফাইট!' মেন্টর যিনি, গুরু যিনি, তিনি দরকারে মারবেন-বকবেন আবার আহ্লাদে মাথায় তুলে নাচবেন, অনটনের সংসারের পয়সা সরিয়ে পুষ্টিকর খাবার কিনে দেবেন শিষ্য-শিষ্যাকে। তিনি শিরোধার্য। অবিশ্যি আজকের স্পনসর-শাসিত কোচিং ক্যাম্প, স্পোর্টস গিয়ার আর সবেধন নীলমণির যুগে ওইরকম নেই-আঁকড়া গুরুবাদ কতজন সহ্য করত কে জানে? তবে সে-কথা আজ থাক। বরং ননীদার কথা বলি।

বাংলা সাহিত্যের সব দাদাদের মাথায় রেখেই বলছি—ঘনাদা, ব্রজদা, ফেলুদা, টেনিদা সবাইকে—ননীদা এক এবং অদ্বিতীয়। একটা বই-এ ননীদার আবির্ভাব এবং এখনও নট আউট। কে এই ননীদা? ইনি হলেন সি সি এইচ অর্থাৎ ক্রিকেট ক্লাব অফ হাটখোলার প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারি, ট্রেজারার, সিলেকটর, স্কোরার, মালী, সাবস্টিটিউট ফিল্ডার, ক্যাপ্টেন এবং মুশকিল আসান। ক্রিকেট-পাগল, টাকমাথা, ঢলঢলে প্যান্ট পরা, বেঁটে কালো লোকটা সিকি শতাব্দী ধরে সি সি এইচ-এর ঝড়ঝাপটা সামলাচ্ছেন, আর গোটা গল্পটাই হল কী করে তিনি তাঁর প্রিয় ক্লাবটাকে টিকিয়ে রাখছেন—তার বিভিন্ন তরিকার বিবরণ। আবারও মনে করা যাক, তখন ক্লাব ক্রিকেটে না ছিল পয়সা, না ছিল স্পনসর। তাই ননীদাকে ক্লাব চালাতে কিছু ট্যাকটিক্স নিতে হত। কালক্রমে সেগুলোই 'ননীটিক্স' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। 'অর্থবান, যশোলোভী, ঈষৎ বোকা ধরনের, তোষামোদ-প্রিয় লোক খুঁজে বার করে, তাকে নানানভাবে জপিয়ে প্রেসিডেন্ট' বানিয়ে (ননীদা বলেন, 'ট্যাকটিক্স প্রয়োগ করে') মোটা টাকা আদায় করার দায়িত্ব ননীদাই এতকাল বহন করে আসছেন। এই টাকার ওপরই ক্লাবের জীবন-মরণের অর্ধেক নির্ভর করে। সবসময় যে শেষরক্ষা হয় তা কিন্তু না। সেবার ননীদা চাঁদমোহন শ্রীমানীকে পাকড়ালো। শাঁসালো মক্কেল। ক্লাবের আদ্যিকালের বল-ব্যাট-প্যাড-গ্লাভস না বদলালেই নয়। শ্রীমানীকে তো সভাপতি করা হয়েছে। মরশুমের শুরুতে সভাপতি একাদশ বনাম ননীদা একাদশ। ম্যাচ না-বলে ফিস্ট বলাই ভাল, 'ননীদা খেলাটাকে প্রীতি সম্মেলন হিসেবে দেখেন পঞ্চাশ ভাগ। পৃষ্ঠপোষকদের তোয়াজ করার জন্য পঁচিশ ভাগ রেখে, বাকি অংশটুকু নবাগতদের ট্রায়াল হিসেবে গণ্য করেন।' তা শ্রীমানী পরিবার গাড়ি-বোঝাই দই-সন্দেশ-কমলালেবু নিয়ে এসেছে। ক্লাবে পোলাও-মাংস রান্না চলছে। ননীদা বললেন, 'গাড়িতে চাবির মধ্যে থাকুক। লাঞ্চের সময় বার করব। এখন টেন্টে নিয়ে গিয়ে রাখলে কিছু বাকি থাকবে না।' শ্রীমানীর প্রশ্ন ক্লাবে চোর-ফোর আছে কি না? ননীদা জানালেন, ছেলেরা দুষ্টু বটে, তবে চোর নয়। 'নয় যে, বুঝলেন কী করে? ক্রিকেটাররা বুঝলেন, রিলেতে শুনেছি, খেলতে খেলতে মাঠের মধ্যেই চুরি করে। পুষ্পেন সরকারকে পরিষ্কার বলতে শুনেছি—অম্বর রায় একটা রান চুরি করল এই ফাঁকে। বুঝুন, মাত্র একটা রান, কতই বা তার দাম। কিন্তু লোভ সামলাতে পারল না।' শ্রীমানী-গিন্নি ক্ষুব্ধস্বরে বলল।

তা সেই শ্রীমানী মশাইকে তো অবশেষে ছক্কা মারার জন্য ব্যাট করতে পাঠানো হল। ভুলেও যাতে সভাপতি আউট না হয় সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল ননীদার। ভণ্ডুল করে দিল রগচটা তন্ময়।



তার আগের বলের নির্ঘাৎ বোল্ড আউট না-দিয়ে 'নো বল' ডাকার প্রতিশোধ নিতে সে শ্রীমানীর কপাল লক্ষ্য করে বল করেছিল। বেচারা জানত না, আহত প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দই, সন্দেশ, লেবুও গাড়ি করে চলে যাবে।

তরুণ মিলন-এর ৪৮ অল আউট-এর বিরুদ্ধে সি সি এইচ ৮ উইকেটে ৩২। বিপক্ষের ফাস্ট বোলারটি দুধর্ষ এবং ভয়ঙ্কর বল করছে। ননীদা নন-স্ট্রাইকিং এন্ড-এ বোলারটির সঙ্গে গল্প জুড়লেন। 'অনেক বড় বড় স্পিনার দেখেছি—ভেরিটি থেকে শুরু করে প্রসন্ন পর্যন্ত, কিন্তু কোনও স্পিনারকে আপনার মতো এতটা দৌড়ে এসে বল করতে দেখিনি।' ননীদার কথা শুনে ফাস্ট বোলার থ! ননীদা ক্রমে ডোজ বাড়ান, 'তবে মানতেই হবে, গুপ্তে কি রামাধীন কি বেনোর থেকে কিছুটা জোরে বল করেন।' আম্পায়ারের কাছে আপিল করেও লাভ নেই। আইনে কোথাও বলা নেই বোলারের সঙ্গে কেউ হাঁটতে পারবে না। ক্রমে বোলারটির বোলিং তো চটকে গেলই, শেষে মেজাজ হারিয়ে ননীদাকে মারতে গিয়ে আম্পায়ারের গায়ে হাত। খেলা ভোগে। সি সি এইচ পুরো পয়েন্ট পায় সেবার। আবার আম্পায়ারকে কব্জা করতেও ননীদার জুড়ি মেলা ভার। বুড়ো আম্পায়ারের বাতের খোঁজ নেওয়া হয়ে গিয়েছে। ছেলে-ছোকরারা যে খেলার আইন কিস্যু জানে না, ভুলভাল আপিল করে সে-কথা দাখিল করা গিয়েছে। বাতের অব্যর্থ কোবরেজি তেল বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয়েছে। দু-চারবার ছদ্ম-আপিল করে ততোধিক ছদ্ম ক্ষমাভিক্ষা করাও হয়ে গিয়েছে, 'ইগনোর ইট আম্পায়ার, কমপ্লিটলি ইগনোর দ্য আপিল। সরি, ভেরি সরি আপনাকে বিরক্ত করার জন্য।' এত বিবেচনাশীল, আইনজ্ঞ যে খেলোয়াড়, সে যখন আপিল করবে তখন কি তা আর নাকচ করতে পারবেন আম্পায়ার? পারবেন না। ওটাই ননীটিক্‌স। না হলে রূপোলি সংঘ-এর সঙ্গে ম্যাচ বাঁচায় কার সাধ্য? সি সি এইচ ১৪ রানে অল আউট। অচিরেই দু'দলের স্কোর সমান সমান। এমন সময় ননীদা বিষ্টুর কানে মন্ত্র দিলেন। বিষ্টু বোলিং রান আপ-এ সারা মাঠ ঘুরতে শুরু করল। ব্যাটসম্যান হতভম্ব, বোলার এরকম ছোটাছুটি করছে কেন? না, বল করতে আসছে।

'এসে পৌঁছাবে কখন?'

'পাঁচটার পর। যখন খেলা শেষ হয়ে যাবে।'

আইনের বই বার করে ননীদার সাফ জবাব : বোলার কতখানি দূরত্ব ছুটে এসে বল করবে, সে সম্পর্কে কিছু লেখা নেই। ফল অবধারিত ড্র।

আর এই সব কিছুই স্রেফ ক্রিকেট খেলাকে ভালবেসে, নিজের ক্লাবটাকে ভালবেসে, স্বার্থ বলতে এটুকুই। আর যাদের ভেতর সত্যিকারের খেলা আছে তাদেরকে খুঁজে বের করা। একদিনে তো আর গরিব, দুর্বিনীত তন্ময়, ননীদার কাছে ফরোয়ার্ড ডিফেন্সিভ খেলার দু'শোবার শ্যাডো প্র্যাকটিস করতে রাজি হয়নি। নিঃসন্তান, বিপত্নীক ননীদা স্ত্রী'র শেষস্মৃতি কানপাশা দু'টো বেঁচে তন্ময়কে টাকা দিয়েছিলেন সেঞ্চুরি করার ইনাম হিসেবে। সে-বৃত্তান্ত পড়তে গেলে আজও চশমার কাচ ঝাপসা। মুছেটুছে দেখি ওপারে একফালি সবুজ মাঠ। মাঠের পরে দেওয়াল। দেওয়ালের গায়ে খড়ি দিয়ে ঘর কেটে নাম্বার দেওয়া আছে। আর মাঠের ঘাসের ডগায় ঝলমল করছে ভোরের নন্দিত মোতি, আমাদের ছেলেবেলার মতি নন্দী।

ছবি : তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়


ছোট, বড় সবার।
সব occasion-এর জন্য বিশাল সম্ভার।
আর দাম, পুরোপুরি সাধ্যের মধ্যেই।
Sreeleathers
KANVAZ
ফ্যাশন দুনিয়ার নতুন প্যাশন
96202
Rs 200/-
Genesis 2878
Sreeleathers
বিশ্বমান। খাঁটি দাম।
Lindsay Street (033) 22861510/11 Free School Street (033) 22861506

ইচ্ছে বিরক্তি রাগ, বেফাঁস কিছু কথা

চলচ্চিত্র পরিচালক নব্যেন্দু চট্টোপাধ্যায় আমাকে বন্ধু বলতে ভালবাসতেন। আমার অপরিচিত অনেককে এ কথা বলে খুশি হতেন। ওঁর প্রথমদিকের ছবিগুলোর মধ্যে শুধু 'অদ্বিতীয়া' দেখেছি। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সুরে লতা মঙ্গেশকারের গানের জন্যে সেই ছবি বিখ্যাত ছিল। তখন আমার সঙ্গে ওঁর পরিচয় হয়নি।

প্রায় দশ বছর ধরে 'দেশ' পত্রিকায় চলচ্চিত্র সমালোচনা করার সুবাদে ছবি দেখতে বাধ্য হয়েছিলাম। সে সময় বছরে তিন-চারটি ছবি বাদ দিলে রাজ্যের কুৎসিত ছবি দেখতে হত। তখন সাগরময় ঘোষকে বলতাম আমাকে নিষ্কৃতি দিতে। ওইরকম এক সময়ে নব্যেন্দু চট্টোপাধ্যায়ের 'আজ কাল পরশু' দেখলাম। অনেকদিন অভুক্ত থাকার পর খাবার পেলে যে অনুভূতি হয় তা-ই হল। ছবিটি ভাল, তাই প্রশংসা করতে দ্বিধা করিনি।

এরপরে ওঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হল। দেখলাম ছবির প্রসঙ্গে গেলেন না, উল্টে আমার লেখালেখি নিয়ে কথা বলতে লাগলেন। যাওয়ার সময় বললেন, 'সমরেশ, এরপর দেখা হলে আমরা আপনি বলব না।'

আজ কাল পরশু'-র পর থেকে নব্যেন্দু এমন বিষয় নিয়ে ছবি করতে লাগলেন যা তাঁকে ব্যতিক্রমী পরিচালকের সাইনবোর্ড দিল। সে সব ছবি প্যানারোমায় নির্বাচিত হয়, বিদেশের ফেস্টিভালে যায় কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের সিনেমা-হলগুলোতে মুক্তি পায় না। 'সরীসৃপ', 'চপার' ইত্যাদি ছবি করে নব্যরীতির পরিচালক হিসেবে তখন তাঁর বেশ নামডাক। সে সময় প্রতিবছর একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটত। রাত্রে ফোন আসত, সমরেশ কাল সকালে বাড়ি আছ? এই ধরো সাড়ে এগারোটায়? আছি শুনেই ফোন রেখে দিতেন। ঠিক ওই সময়ে আমার কাছে এসে জাঁকিয়ে বসতেন। বিদেশি সিগারেট এগিয়ে দিয়ে বলতেন, 'পরের ছবির জন্যে একটা বিষয় ভেবেছি।' সেটা বলে আমার মতামত জানতে চাইতেন। প্রথমদিকে আমিও ইনভল্‌ভড হয়ে যেতাম। নিজের মতামত দিতাম। তর্ক হত। শেষে দু'জনে মিলে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছতাম। এই করতে করতে ঘণ্টা তিনেক পার হওয়ার পর জানতে পারতাম বাইরে ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে রেখেছেন। আমি হতভম্ব। বাইরে বেরুনো মাত্র ট্যাক্সিওয়ালা চেঁচামেচি শুরু করল। নব্যেন্দু জোর করে আমাকে সেই ট্যাক্সিতে বসিয়ে নিয়ে গেল সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ কফিখানায়। দেখলাম ট্যাক্সির ভাড়া মেটাতে ওঁর পকেট খালি হয়ে গেল। গোটা দিন আমরা ছবি নিয়ে আলোচনা করে গেলাম। সন্ধের পরে আর একটা ট্যাক্সি নিয়ে আমাকে বাড়িতে নামিয়ে চলে গেলেন টালা পার্কের বাড়িতে। নিশ্চয়ই ট্যাক্সির ভাড়া বাড়ি থেকে নিয়েই মিটিয়েছিলেন। তারপর প্রায় একবছর যোগাযোগ নেই। এর মধ্যে কাগজে পড়েছি তিনি শুটিং শুরু এবং শেষ করেছেন। জানতে পারলাম, ক্লোজড ডোর শো করে বন্ধুদের ছবি দেখিয়েছেন। তারপর সেই ছবি প্যানারোমায় নির্বাচিত হল। নব্যেন্দু আমার সঙ্গে যোগাযোগ করছেন না। হঠাৎ এক রাত্রে ফোন এল, 'সমরেশ, কাল সকালে বাড়ি আছ?' নব্যেন্দু এলেন। পরের ছবির বিষয় নিয়ে গতবারের মতো আলোচনা করলেন। আমি আর না পেরে জিজ্ঞাসা করলাম, 'তোমার আগের ছবি দেখার সুযোগ পাইনি কেন?' নব্যেন্দু হেসে বললেন, 'ঠিক জুৎ করতে পারিনি বলে দেখাইনি। কিছু মনে কোরো না।'

ছবি করেছেন, ফেস্টিভালে দেখানো হয়েছে, বিদেশেও গিয়েছেন। প্রযোজকরা টাকা ফেরত পাননি, নিজেও না। একদিন না পেরে ফোন করলাম, 'এমন ছবি করেন কেন যা দর্শক দেখতে চায় না।'

'ডিস্ট্রিবিউটর না নিলে—!' থেমে গেলেন নব্যেন্দু।

'নেবে কেন? পকেটের টাকায় যে প্রিন্ট করবে তার দামই তো উঠবে না।' সত্যি কথা না বলে পারিনি।

দারুণ মেজাজি এই লোকটি বামপন্থী আদর্শে বিশ্বাস করতেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে টানত। সেই মানুষ মৃত্যুর বছর তিন আগে আমায় বললেন, 'ভুল করেছি। সারাজীবন ভুল করে এসেছি। অদ্বিতীয়া যেমন করা উচিত হয়নি তেমনি এই ছবিগুলোও। আমি স্বাভাবিক জীবনের গল্প নিয়ে ছবি করতে চাই সমরেশ। একটা গল্প বেছে দিন।'



বড় দেরি করে ফেলেছিলেন নব্যেন্দু এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে।

আমরা যাঁরা লিখছি, অথবা ছবি আঁকছি, তাঁদের খ্যাতির শীর্ষে উঠতে এক বা দুই যুগ লেগে যায়। জীবনের প্রথম উপন্যাসে আমি বিখ্যাত হয়ে গেলাম, পাঠকরা এক ডাকে চিনল—এরকম ঘটনা সচরাচর ঘটে না। ঘটলেও সেইসব লেখকরা হারিয়ে যান অল্প কিছুকালের মধ্যে। যেমন যাযাবর, অবধূত। তারাশঙ্কর থেকে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়কে লিখে লিখে তিল তিল করে খ্যাতির সাম্রাজ্যে তৈরি করতে হয়েছে। শ্রদ্ধেয় সাগরময় ঘোষ বলতেন, 'স্প্রিন্টার লেখকের কোনও মূল্য নেই। লেখককে হতে হবে ম্যারাথন-দৌড়িয়ে। বছরের পর বছর তাকে দিয়ে যেতে হবে। অন্তত, এই দেশে। তুমি হেমিংওয়ের মতো কয়েকটা লিখেই একশো বছর বেঁচে থাকতে অন্তত বাংলাভাষায় লিখে পারবে না।'

কথাটা অত্যন্ত সত্যি। সুনীল গাঙ্গুলি পঞ্চাশ বছর ধরে লিখে চলেছেন। 'দেশ' পত্রিকায় তাঁর উপন্যাস 'আত্মপ্রকাশ' বেরিয়েছিল চুয়াল্লিশ বছর আগে। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের 'ঘুনপোকা' তেতাল্লিশ বছরে পড়ল। এবং এই দীর্ঘসময় ধরে 'আমিই সে', 'একা এবং কয়েকজন', 'সেইসময়', 'প্রথম আলো' 'পূর্ব-পশ্চিম' অথবা 'পারাপার', 'দূরবীন', 'মানবজমিন' ও 'পার্থিব', চক্রের মতো উপন্যাস তাঁদের কাছ থেকে আমরা পেয়েছি।

চলচ্চিত্রের পরিচালকরা ভাল ছবি করতে পারলেই রাতারাতি যে খ্যাতির চুড়োয় উঠে বসেন তা সামলানো অনেকের পক্ষে সম্ভব নয়। ছবিটি ভাল হলেই খবরের কাগজে প্রশংসার বন্যা বয়ে যায়, টিভিতে আলোচনা চলে, যাঁরা সেই ছবি দেখেননি তাঁরাও পরিচালকের নাম জেনে যান। নব্যেন্দু চট্টোপাধ্যায়, নীতিশ মুখোপাধ্যায়, উৎপলেন্দু চক্রবর্তী, অশোক বিশ্বনাথনদের সেই কারণে এখনও সবাই মনে রেখেছেন। সত্যজিৎ রায় অথবা তপন সিংহ অথবা ঋত্বিক ঘটক বারংবার প্রমাণ করেছেন নিজেদের। সংযমী জীবনযাপন করায় প্রথম দু'জন দীর্ঘকাল ধরে সৃষ্টিশীল ছিলেন। কিন্তু যাঁরা বিখ্যাত হয়েই হারিয়ে গেলেন তাঁদের যোগ্যতা সম্পর্কে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক।

অপর্ণা সেন বা ঋতুপর্ণ ঘোষ তাঁদের প্রথম ছবিতেই আমাদের চমকে দিয়েছিলেন। লক্ষ রাখতে হবে, 'থার্টি সিক্স চৌরঙ্গি লেন'-এর পরে অপর্ণা অনেকটা সময় নিয়েছিলেন দ্বিতীয় ছবি করতে। প্রতিটি ছবি বাংলা চলচ্চিত্রকে সমৃদ্ধ করছে। ওই ম্যারাথন রেসে সত্যজিৎ-পরবর্তী প্রজন্মের চলচ্চিত্রকারদের মধ্যে তিনিই সবচেয়ে এগিয়ে। ঋতুপর্ণ ঘোষের 'উনিশে এপ্রিল' দেখে চমকে উঠেছিলাম। পুরনো কাঠামো ভেঙে ফেলে আধুনিক জীবনের সম্পর্কের সংঘাত, চলচ্চিত্রের ভাষায় বলতে পারলেন তিনি। তারপরে অনেকগুলো ছবি হয়ে গেল তাঁর। পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছেন, সবসময় যে সফল হচ্ছেন তা বলা যাবে না কিন্তু তিনি অপর্ণা সেনের মতো দর্শক তৈরি করতে পেরেছেন। দর্শকরা ওঁদের ছবি দেখতে চান বলেই ডিস্ট্রিবিউটররা আগ্রহী। এই ব্যাপারটা সত্যজিৎ, তপন সিংহ, তরুণ মজুমদারের ছবির ব্যাপারে দেখা গিয়েছে। এঁরা ছবি শেষ করলেই দর্শকদের বৃহৎ অংশ উন্মুখ থাকত তা দেখার জন্যে।



গল্প শুনেছি, ডিস্ট্রিবিউটর পাড়ায় এক ভদ্রলোক ছিলেন যিনি ছবি দেখে বলে দিতেন দর্শক নেবে কি না! সব ছবির প্রযোজক-পরিচালক ভাবেন তাঁদের ছবি সুপারহিট করবে। বাস্তবে প্রায়ই উল্টো ফল হয়। সেই ভদ্রলোকের ওপর ভরসা করে নাকি ডিস্ট্রিবিউটররা ক্ষতিগ্রস্ত হননি। তিনি চলবে বললে তাঁরা ছবির দায়িত্ব নিতে চাইতেন। হয়তো এটা নিছক গল্পই, কিন্তু যাঁরা সাধারণ দর্শকদের কথা ভেবে ছবি করেন না, প্রযোজকের প্রায় আধ কোটি টাকা খরচ করেও ডিস্ট্রিবিউটর পান না, পেলেও সাতদিনে ছবি হল থেকে উঠে যায়, তাঁদের কোনও কৈফিয়ৎ দেওয়ার দায় নেই। বেচারা প্রযোজক লোকসান সামলাতে হিমসিম খান, কিন্তু মিডিয়ার দৌলতে প্রচার পাওয়া পরিচালক হাসিমুখে বিভিন্ন অনুষ্ঠানকে ধন্য করেন। আবার এর ব্যতিক্রমও আছে।

আমার বন্ধু প্রথম ছবি করেছিলেন খুব মন দিয়ে। তাতে নায়ক এই ঘর থেকে ওই ঘর যেতে অনেক টান দিয়েছিল সিগারেটে, ছবিটি দেখতে দ্বিতীয় দিন থেকে দর্শক খুঁজে না পাওয়ায় তুলে নিতে হয়েছিল হল থেকে। ওঁর পরের ছবি কমলকুমার মজুমদারের গল্প। রেললাইন থেকে পোড়া কয়লা তুলে বেঁচে থাকা চরিত্র নিয়ে তৈরি ছবির একই দশা হল। কিন্তু তিনি হেরে যাওয়ার মানুষ নন। তারপর থেকে অনেকগুলো ছবি করেছেন। যতটা মনে করতে পারছি, তাঁর 'গৃহযুদ্ধ' মুক্তি পেয়েছিল এবং দর্শকদের ভাল লেগেছিল। কিন্তু তারপর থেকে তিনি যতগুলো ছবি তৈরি করেছেন তার বেশিরভাগই প্যানোরমায় নির্বাচিত হয়েছে, জাতীয় পুরস্কার পেয়েছেন, বিদেশের চলচ্চিত্র উৎসবে আমন্ত্রিত হয়ে সম্মানিত হয়েছেন। আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র মহলে সত্যজিৎ-পরবর্তী বাংলা ছবির নির্মাতাদের মধ্যে তিনিই সবচেয়ে বেশি প্রচারিত এবং গৃহীত। কিন্তু তাঁর ছবি দেখার সুযোগ বাঙালি দর্শক পায় না। হয় তিনি আগ্রহী নন, নয় ডিস্ট্রিবিউটররা এগিয়ে আসেন না। ইতিমধ্যে দু-একটি ছবির ক্ষেত্রে চেষ্টা হয়েছিল কিন্তু বাঙালি দর্শকরা তাঁকে নিতে পারেনি। এখানেই প্রশ্নটা উঠছে। বাংলায় ছবি করে বাঙালি দর্শকের কাছে না পৌঁছে আন্তর্জাতিক বাজারে খ্যাতি পাওয়া সবার ভাগ্যে সম্ভব হয় না। তাঁর হয়েছে। একের পর এক ছবি করে যান। নামী দামি শিল্পীদের নিয়ে তৈরি ওই সব ছবির বাজেট অনুমান করাই যায়, কিন্তু প্রযোজক ক্ষতিগ্রস্ত হন না। শোনা কথা, আন্তর্জাতিক বাজারে তাঁর ছবি যে দামে বিক্রি হয় তা সুপারহিট মেনস্ট্রিমের ছবির আয়ের চেয়ে কম নয়।

খুব ভাল কথা। ছবির ভাষা, সাবটাইটেল থাকলে পৃথিবীর যে কোনও ইংরেজি জানা মানুষ বুঝতে পারে। ফরাসি বা স্প্যানিশ ভাষায় ওটা লিখলে ওই ভাষাভাষীদের কাছে পৌঁছনো সম্ভব। আমরা যারা বাংলা ভাষায় লিখি, তাদের বই ইংরেজি বা স্প্যানিশে অনুবাদ করার পর সমস্ত পৃথিবীর লোক পড়ল কিন্তু কোনও বাংলা ভাষাভাষী পড়লেন না, এটা ভাবলে শরীর ঝিমঝিম করে। মায়ের ভাষার পাঠক না পেলে লিখে সুখ নেই। এত সাফল্য পেয়েও আমার বন্ধুটি কি সুখী?

নিরুদ্দেশ সম্পর্কে ঘোষণা

অ নি ন্দ্য চ ট্টো পা ধ্যা য়

মিডল নেম

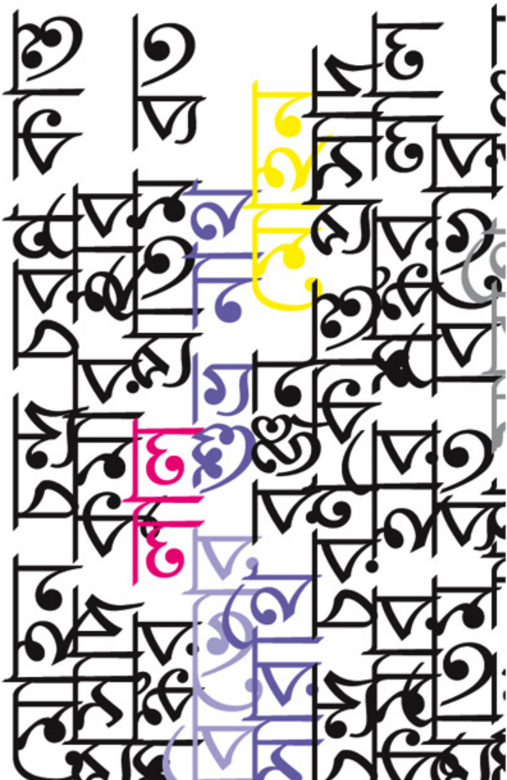
যে জন আছে মাঝখানে। তার হাজারো হ্যাঙ্গাম। ফালতু ফ্যাচাং। বাসের সিট যেমন। জানলার ধার পেলেন তো পেলেন, নইলে মধ্যিখানে বসে স্যান্ডুইচসেদ্ধ। ওমে, ঘামে এর লীনতাপ অন্যের পকেটে বিলীন হয়ে গেল। দু'দিকের প্রবল চাপে আরও একটু সংকুচিত হয়ে গেল পাবলিক। কুঁকড়ে, গুটিয়ে ছোট্টটি হয়ে খাটান দাও গোটা পথ। দুই ধারে দুই মেথর মধ্যিখানে পাথর। ভুতুম হয়ে নৈর্ঋত কোণে চেয়ে থাকো। মাঝে-মাঝে দৈববাণী শোনা যাবে, দাদা, আর একটু চাপুন তো, এট্টু চাপুন। মানে আরও একজন সেধোঁবে। মাঝখানে ভিড় বাড়বে। মধ্যিখানের মানুষ প্রতিবাদ করে না, করতে নেই। বেফাঁস কোনও ফোঁস উঠলেই, সবাই বলবে, চেপে যান, চেপে যান। ফলে চাপুন এবং চেপে যান। গুটিসুটি মেরে থাকুন। মনে রাখবেন স্বর্গ-মর্ত-পাতাল-এর মাঝখানে রয়েছে আমাদের মায়াগোলক। মাঝখান মর্তে এয়েছেন মরতে। ওপর থেকে সপ্তো চাপ দিচ্ছে, নীচ থেকে পাতাল টুঁসোচ্ছে, আপনি খলবল করছেন মাঝেরহাট ব্রিজ-এ। কোনও দরকার ছিল না মাঝখানে থাকার, বাই ডিফল্ট, ঢুকে পড়েছেন মঞ্চে, থুড়ি, মর্তে। এবার লাও, তোমার ম্যাও, তুমি সামলাও। আগে গেলে বাঘে খায়, পরে গেলে সোনা পায়। অগ্র আর পশ্চাতের কথাই বলা আছে শাস্ত্রে। কিন্তু মাঝে যে যায়? মধ্যিখানে? সে কী পায়? কাঁচকলা খায় না ষোলো কলা পায়? কোত্থাও বলা নেই। সভ্যতার সবচেয়ে অকিঞ্চিৎকর জায়গা হল মাঝখান। ওই গাড্ডায় পড়েছ কী মরেছ! মেজো হওয়ার মতো খারাপ আর কিছু আছে কি! মধ্য শুধুই অকালবধ্য! মধ্যবিত্ত ক্যালানেচিত্ত, বিলাপ করিয়া মরে...

একটু যদি সময়ের হেরফের হত, দুই বাঙালি নোবেল প্রাপকের যদি স্থান পাল্টাপাল্টি হত, নিশ্চিতভাবেই নোবেল পেতেন শ্রী অমর্ত্যমোহন সেন আর রবিন ঠাকুর। হ্যাঁ, চমকে উঠবেন না, সময়ই এফিডেফিট করে নিত এই দু'টি নাম। এমন কেন হত? কারণ, দাদামশাই বা ঠাকুরদা-র মধ্যনামটুকু নিশ্চিতভাবেই ব্যবহার করতেন অমর্ত্য সেন, যা তাঁর নামটিকে দিত অনন্য বিশিষ্টতা, অন্যদিকে কালের করাল গ্রাসে হয়তো রবীন্দ্রনাথ খোয়াতেন তাঁর 'নাথ হে', অর্বাচীন কালসর্প তাঁর নাম থেকে চুরি করে নিত প্রগাঢ় মধ্যম, তিনিও পরিণত হতেন সাদাসাপটা অত্যাধুনিক নেমপ্লেট-এ।

এ সবই হয়তো, কিন্তু, তথাপি—শব্দবন্ধের কল্পনাবিলাস—বাস্তব হল এই, আমাদের প্রজন্ম বাড়তিটুকু ত্যাগ দিয়েছে বহুকাল। বাপ, ঠাকুরদাদের থেকে পারিবারিক মধ্যনাম আর আমরা ব্যবহার করি না। আমরা এখন নামে-বদনামে ঘোরতর রকমের স্লিম, বংশলতিকার বাতি ট্রিমট্রিম করতে করতে পুরোদস্তুর ঝরঝরে। অমুককুমার পাকড়াশীর পুত্র শুধুই তমুক পাকড়াশী কিংবা হ্যানারঞ্জন সরখেলের নাতি কেবলই ত্যানা সরখেল। কোন ম্যাজিকে কে জানে, মধ্যনামটুকু চিরতরে ভ্যানিশ। ইটস গন, গায়েব, চলে গেছে। মাথাব্যথার মতো। আধুনিকতার এক ওষুধেই বাদ, মধ্যটুকু বেঘোরে বরবাদ। সারি সারি মোহন, রঞ্জন, কান্ত, ব্রত, সারথি, নাথ, প্রসাদ, কুমার, শঙ্কর, চরণ, গোপাল, কুসুম, প্রতিম, বিহারী—মুখ লুকিয়েছে নিঃশব্দে। কেউ নেই। সব বাতিল জরদ্গব। মাঝের নামগুলো গোপনে সাজিয়ে রাখা সাধের কুলুঙ্গিতে, না খোলা সিন্দুকে। আর কেউ বার করবে না কোনওদিন। কেউ সেজে উঠবে না বাহারি নামফলকে। কোনও বাঙালি কন্যার নামেও কি আর কখনও যুক্ত হবে বালা, লতা কিংবা রানী-র মতো মধ্যনাম? তারাও মানে মানে সরে পড়েছে নামকরণের নতুন গয়না থেকে। এখন নাম অনেক বেশি স্ট্রেটকাট, স্পষ্ট, বিলাসবিহীন। তা সাইজমাফিক, ঠিকঠাক। কোনও নিশিকান্ত বসুর পুত্রের নাম আর কখনওই জ্যোতিকান্ত বসু হবে না কোনওদিন। অম্লানকুসুম দত্ত-এও ম্লান হয়ে যায় কুসুম।

অ্যাপেন্ডিক্সের মতো অ-কেজো এমন একটা জিনিস বাঙালি নামসমাজে বাসাটা বাঁধল কীভাবে? কোন সময় থেকে নামের লেজুড় হয়ে তা উড়ে এসে জুড়ে বসেছিল? সঠিক উত্তর জানা নেই। কোনও কোনও তাত্ত্বিকের মতে, ষোড়শো শতাব্দীর পর থেকে বাঙালি নামে এমন মধ্যচর্চার আগমন। বাঙালি ধারে ও ভারে তখন বিশিষ্ট হতে চাইছে। আঠেরোশো শতকে তারই রমরমা, বহিরঙ্গ ডগমগ ও পরিপূর্ণ। বাবু শ্রীল শ্রীযুক্ত-র পর থেকে আরও একটু মহিমা, ওজস্বিতা, আরও একটু গাম্ভীর্য দেওয়ার জন্য মধ্যনামগুলি জাঁকিয়ে বসল বঙ্গভূমে।

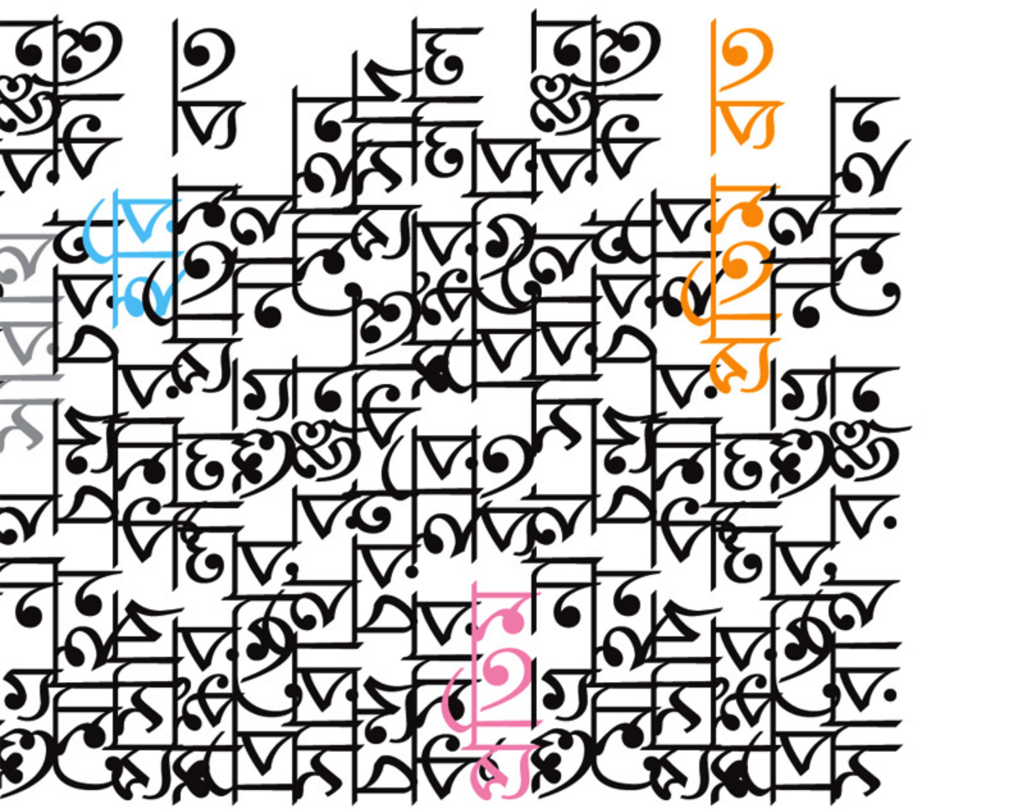
নাম নামে শেষ হত না, তা আরও একটু এগিয়ে যেত মাঝেরটুকুর হাত ধরে। এ-কথা সত্য ঈশ্বর গুপ্ত-র মধ্যনামটুকু গুপ্ত, কিন্তু এ আরও বড় সত্য বিহারীলাল চক্রবর্তীর গীতিকাব্যময়তা যেন তাঁর লালেই পরিস্ফুট। ঈশ্বরচন্দ্র



বন্দ্যোপাধ্যায়, মধুসূদন দত্ত, রামমোহন রায়, চিত্তরঞ্জন দাশ, সুভাষচন্দ্র বসু, নরেন্দ্রনাথ দত্ত—শতকরা পঁচানব্বই ভাগ বাঙালি সিংহপুরুষের নামে জুড়ে রয়েছে সিংহমধ্যম—ওটুকু ছাড়া তাঁরা কিন্তু অ-পাঠ্য, অ-বোধ্য। রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র—স্বর্ণাক্ষরী সব ক'টি নামের শেষ দু-অক্ষর মধ্যনাম, ওই চাঁদটুকু বাদ দিয়ে দিলে সাহিত্যের আকাশে জ্যোৎস্নার দেখা মিলত কি না সন্দেহ! তারাশঙ্কর বা বিভূতিভূষণই বা বাদ যান কী করে? প্রমথনাথ বিশী থেকে সতীনাথ ভাদুড়ি—সর্বত্র ছেয়ে আছে মধ্যনাম। সফল বাঙালি পুরুষের সকল পরিচয়ে সে আছে, প্রবলভাবে আছে। এদিক-সেদিক তাকালে ব্যতিক্রম কি নেই? আছে, তবে তা সংখ্যায় অল্প। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর পুত্র সুকুমারকিশোর রায়চৌধুরী হননি, নাতি অগুন্তি কিশোরপাঠ্য লিখলেও, হয়তো বা পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করেই, তিনিও ত্যাগ দিয়েছেন কিশোর। কিন্তু কী আশ্চর্য, প্রদোষচন্দ্র, তপেশরঞ্জন কিংবা লালমোহনবাবুর সর্বাঙ্গে ঝলমল করছে মধ্যনামের অলংকার।

মধ্যনামগুলো কী দিত? বর্ণাঢ্য এক পরিচয়লিপি? বংশের ঐতিহ্যগরিমা? হয়তো বা তাই। বাবুয়ানির শেষ রেশটুকু হয়তো মিলেমিশে ছিল নামগুলোর মধ্যে। আরও বৃহৎভাবে জীবনকে বাঁচতে চাওয়ার লাইসেন্স হয়তো-বা দিত মধ্যনামের ওজন। যে ছেলের নাম প্যারীমোহন বা বিশ্বরঞ্জন কিংবা জাহ্নবীচরণ—সে ছেলে নিশ্চয়ই জীবনে ছিঁচকে কিছু করতে পারবে না—এই অমল বিশ্বাসটুকু হয়তো পরিবারের ছিল। বংশের মানমর্যাদা, কৌলীন্যজ্ঞাপনে তাই নিরলস প্রচেষ্টা ছিল নামকরণকারীর। এমন নাম, যা মুহূর্তে তাকে মনে করিয়ে দেবে সামাজিক পদমর্যাদার কথা, অর্ঘ্যকমল বা রবিরঞ্জন-এ তা যেন থাকে সারাক্ষণ অত্যুৎজ্জ্বল, ঝকমকে।

মহিলাদের বড়ো একটা মধ্যনাম নেই। সামাজিক হেলাফেলায় তাদের বেলা বয়েছে বহুকাল, অন্দর থেকে প্রকাশিত হওয়ার শুভক্ষণটি যখন এল, ততদিনে মেজনামটির পঞ্চত্বপ্রাপ্তি ঘটেছে। ওই গিরিবালা, শশীবালা, আঙুরবালা, পুণ্যলতা, তরুলতা বা রাধারানী—সবই স্ত্রীলিঙ্গে নমনীয় ঠেকনা—বিবিয়ানির তপ্ত তেজ সেখানে দপ করে ওঠে না, (হালের এক-আধটা কাঞ্চনমালা বা প্রতিমাপ্রতিম ব্যতিক্রম), যেমনটা বাড়ির বড়ছেলের নামে ঘটে। বিদ্যায় অষ্টরম্ভা হলেও পুরুষটির নাম হতে হবে জ্ঞানেন্দ্রশেখর, রামভিতু হলেও কর্তার নাম হওয়া চাই শৌর্যেন্দ্রপ্রতাপ, কেলেকুষ্টি হলেও কন্দর্পনারায়ণ চৌধুরী—যেন, পদ্মলোচন উপাধিপ্রাপ্তিতেই যত জম্মট্যারার দুঃখমোচন। ফলে মধ্যনামটুকু আদতে পুরুষালি। পুরুষ, যে কিনা বংশ বয়ে নিয়ে চলে প্রজন্মের পর প্রজন্ম। বংশের আছোলা মান মর্যাদা-মানিব্যাগ তারই দর্পে রক্ষিত কিনা! মধ্যনামটুকু তার, শুধু তার। ছোটবেলায় আধো-আধো উচ্চারণে পুরো নাম বলতে নিশ্চয়ই বাবুদের দু'তিন মিনিট যেত। মধ্যনামে বাবুয়ানির প্রবল পরাক্রম ছিল। তালপুকুরে ঘটি ডুবুক, না-ডুবুক, ডালকুকুরের মতো টমি-রোমি-বমি গোছের নাম



দিত না কখনও।

মধ্যনাম কিন্তু শুধুই নিরাসক্ত জুড়ে থাকা নয়। হুজুরের লেজুড় হিসেবে আজীবন রয়ে গেল—এমনটাও নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মূল নামটিকে পূর্ণাঙ্গ করত এটি। মধ্যনামটি না উচ্চারণ করলে, নামের মর্মার্থ অনুধাবন করা যেত না। যার নাম হত পার্থসারথি, তাকে পার্থ বলে ডাকাটা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। ঋদ্ধিশঙ্করকে যদি কেউ শুধুই ঋদ্ধি বলে ডাকে, তা হলে লিঙ্গ পরিবর্তনের মতন একটা বিষম কাণ্ড উপস্থিত হবে। বর আর বরকন্দাজ যেমন এক নয়, ঠিক তেমনই রাধিকা আর রাধিকামোহন এক নয় কোনও মতেই। কিংবা উমা ও উমাকান্ত। সর্বক্ষেত্রেই প্রাথমিক নামটুকুকে সমাপ্ত করছে, স্বয়ংসম্পূর্ণ করছে মধ্যনাম। সেটি উচ্চারণ না করলে বেচারি মূল-নামটা একেবারেই মাঠে মারা যাবে।

ফলে আর একটি তত্ত্ব কী? যে, মধ্যনাম বলে আসলে কিছু নেই। পুরোটাই একটা নাম। মূল নামেরই আর একটি অংশ হল মধ্যনাম। একটি আর একটির সঙ্গে উলের বোনার মতো সংশ্লিষ্ট। আলাদা করে তাকে ডাকলে পরিস্থিতি ঘোরালো হবে, জরুরি অবস্থার সৃষ্টি হবে। অর্থাৎ নামের প্রকৃত অর্থ লুকিয়ে রয়েছে হৃদমাঝারে, সম্পূর্ণ উচ্চারণেই তা খোলতাই হবে ঠিকমতো। এমন অনেক সুরসিক গুরুজন আছেন, যাঁরা এমন নামকরণে সিদ্ধহস্ত। নামটিকে সুচারুভাবে তাঁরা মিলিয়ে-মিশিয়ে দিয়েছেন পরের অংশটির সঙ্গে। সম্পূর্ণ করেছেন বৃত্তটি অনায়াস নিপুণতায়। কিছু কিছু বাড়ির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা ছিল মধ্যনামে। যেমন, শোভাবাজার রাজবাড়ি। একতরফের নামে সেখানে নারায়ণ যোগ করতে হয় আজও। হালফিলের ববি বা বাবুল যদি কখনও নারায়ণ-এ যুক্ত হয়, তবে ভারি বেখাপ্পা ব্যাপার ঘটবে।

বাঙালি মধ্যনামের সেরার শিরোপা উঠবে কার মাথায়? বহুল জনপ্রিয় একটি হল কুমার। একটা সময়, মধ্যনামযুগে, যদি 'চন্দ্র' শাসন করে থাকে, তা হলে আধুনিকযুগ শাসন করেছে 'কুমার'। অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কথাই ধরুন। সে ভদ্রলোকের তো নাম, পদবি—কিছুই মানুষ মনে রাখতে পারল না, মাঝের নামটুকু ছাড়া! পর্দার নাম উত্তম-এর সঙ্গে তিনি জুড়ে নিলেন বাপ-ঠাকুরদার 'কুমার'। উত্তমকুমার নামটি হল নিখাদ তারকার নাম, এ নামের সঙ্গেই জুড়ে আছে স্নিগ্ধ হাসি, কোমল বাঙালি জীবন ও কত শত বঞ্চিত কুমারী হৃদয়। 'কুমার'-পাড়ার এমন গরুর গাড়ি অবশ্য বহু নায়কই চালিয়েছেন। গায়কও। প্রদীপকুমার বটব্যাল নিখুঁত এডিটিং অন্তে হয়ে দাঁড়িয়েছেন প্রদীপকুমার, আভাসকুমার গাঙ্গুলি—শুধুই কুমার-কে গ্রহণ করে—কিশোরকুমার। কিংবদন্তি বড় তারকা মাত্রই, তাঁর নামের শেষে একটি কুমার ঝুলবে—সে সময় এই ছিল দস্তুর। হাল আমলে কুমারদের রমরমা কমেছে। একজন অক্ষয়কুমার কোনওমতে মান বাঁচাচ্ছেন প্রবীণ অশোককুমার বা রাজেন্দ্রকুমারের।

এ-কালে যেমন খান বাহাদুর, সে-কালে বম্বের স্টার মানেই কুমার বাহাদুর। আগে আপনি যাই করুন, ল্যাজে আপনাকে 'কুমার' যোগ করতে হবেই। গোটা বাংলা যাঁর গানে উত্তাল, সেই হেমন্ত মুখোপাধ্যায় পর্যন্ত কুমারত্ব পেলেন আরবসাগরের তীরে, জন্ম নিলেন হেমন্তকুমার। অমন সুরেলা-কণ্ঠ জগন্ময় মিত্র, আরব দস্যুর হাতে পড়ে হয়ে গেলেন জগমোহন—সকলেরই অন্তে একটি করে মধ্যনাম। জিন পাল্টায়, নাম পাল্টায়, স্থান পাল্টায়। কেদারনাথ ভট্টাচার্য একদিন হয়ে যাবেন কুমার শানু, কে জানত। এক্ষেত্রে লক্ষণীয়, নামের শেষ থেকে কুমার উঠে এসে, আগে যুক্ত হচ্ছে। দিন পাল্টায়, কুমার পাল্টায় না। কবীর সুমন তাঁর একটি গানে কতকটা এই গোছের একটা লাইন লিখেছিলেন—বাঙালি গায়কেরা নামের আগে পরে কুমার লাগিয়ে/ চিরকুমার সভার জলসাঘর রেখেছে জ্বালিয়ে। মহাতারকাদের এই চিরকুমার সভায়, কারুর কৌমার্য এতটুকু ক্ষুণ্ণ হয়নি কখনও। রূপালি পর্দায় সোনালি অমরত্ব পেয়েছে কুমারত্ব।

ব্র্যাকেটে বম্বের কথা না হয় এবার একটু বাদই থাক। আর একটু উচ্চাঙ্গমার্গে বিচরণ করা যাক। সেখানেও মধ্যনাম পিঁড়ি পেতে দাঁড়িয়ে। উদয়শঙ্কর চট্টোপাধ্যায় হয়ে গেলেন শুধুই উদয়শঙ্কর, তাঁর স্ত্রী-ও হয়ে গেলেন অমলাশঙ্কর, ভাই রবিশঙ্কর—মধ্যনামের এমন কুশলী প্রয়োগ কিন্তু বাঙালি পরিবারে আর ঘটেনি। নারী-পুরুষ সদস্য নির্বিশেষে শঙ্কর গায়ে তুলে নিচ্ছেন, ওই মধ্যনামটুকুই আলাদা করে পরিবারটিকে চিনিয়ে দেয়, সভ্রান্ত স্থানটি সযত্নে রক্ষা করে। যে 'শঙ্করস্কোপ' নিয়ে আমাদের এত কৌতূহল, গর্ব, উন্মাদনা—তারও নামটি সূচিত হয়েছে সেই 'মিডল নেম'-টি থেকেই। একটি মধ্যনাম ক্রমে ক্রমে যেন উপাধিতে পাল্টে গেল। আনন্দশঙ্কর, তনুশ্রীশঙ্কর, মমতাশঙ্কর থেকে নতুন প্রজন্মের রাতুলশঙ্কর—কেউই আর শঙ্করমুক্ত নন। এমনকী মমতাশঙ্করের বা তনুশ্রীশঙ্করের অনেক ছাত্রছাত্রীও নিজেদের নামের সঙ্গে শঙ্করটি জুড়ে নিয়েছেন অক্লেশে, মধ্যনামটি একটি বিশেষ ঘরানা, স্টাইলের কথা বলে যায়। শঙ্কর প্রজাতি মানেই তো স্বতন্ত্র, বিশিষ্ট, শ্রদ্ধেয়।

সব মধ্যনামের কপালে এতটা সম্মান জোটেনি। কারুর কারুর কপাল ভাল। তারা ইতিহাসের খাতায় রুল টানতে পেরেছে। যেমন—'মোহন' মধ্যনামটি। বাঙালি মাত্রই মোহন শুনলে দস্যু মোহন, মোহনবাগান আর মোহনভোগের কথা ভাবেন, কিন্তু সংগীতজগতে 'মোহনবীণা'—সুরযন্ত্রটি দীর্ঘদিনই জনপ্রিয়। প্রায় হাওয়াইয়ান গিটারের মতো দেখতে সুরবাহারটিকে, অধুনা বাজিয়ে থাকেন বিশ্বমোহন ভাট। তাঁর মধ্যনাম থেকেই নাকি আধুনিক বীণাটির এ রূপ নাম। অন্য একটি মত, আসলে মোহনবীণা সৃষ্টি করেছিলেন বাঙালি সুরজ্ঞ রাধিকামোহন মৈত্র। তাঁর হাতেই এই যন্ত্রটির জন্ম। রাধিকামোহনের মোহন নিয়ে মোহনবীণা-র নাম। এ ভারি আশ্চর্য কাণ্ড! যাঁদের ঘিরে যন্ত্রটির বিতর্ক, তাঁদের দু'জনের মধ্যনামটিই এক। যিনিই প্রকৃত দাবিদার হোক না কেন, স্বস্তির কথা এই যে, ইন্সট্রুমেন্টের নামটি তো আর পাল্টাচ্ছে না। তা মোহনবীণাই থেকে যাবে চিরটাকাল। অবহেলার মধ্যনামের লিস্টিতে, এ এক কুলীন সংযোজন, বিরল উপাধিপ্রাপ্তি।

মধ্যবিত্ত হয়ে কে আর বাঁচতে চায়? মাঝখানে থাকার সত্যি কোনও মানে আছে কি? হয় তুমি হও অতিরিক্ত অথবা উচ্চবিত্ত। মাঝামাঝি কোনও পন্থা নেই, একেবারে নেই। আসলে মধ্যবিত্ততা একপ্রকার উদ্বায়ী অবস্থান, কখনও পিছনে টানছে, কখনও ওপরে তুলছে। এই দেশ, এই বিশ্ব, এই সমাজ, এই সংসার—সারাটাক্ষণ সেই অনিত্যসূত্রের কথা বলে যায়। এই ঝুলে থাকা কাঁহাতক আর ভাল লাগে! ফলে উত্তমকুমার আর অধমকুমার শুম্ভ নিশুম্ভের মতো জড়াজড়ি লড়ালড়ি চালাক, মধ্যমকুমার দূর হটো। নতুন বিশ্বে আরও গ্লোবাল হয়ে উঠুক বাঙালি। স্লিম হয়ে উঠুক আরও। বাড়তি মেদ ঝরিয়ে দিক অবিরত। একটু মর্নিংওয়াক, একটু ট্রেডমিল—ছিপছিপে করে দিক সকল অহংকার। বংশমর্যাদা নামক ছেঁদো জিনিসটার আর কোনও ভূমিকা নেই কোথাও। বাপ-পিতেমোর ভিটে ছেড়ে বহুদিনই বিদায় নিয়েছে বাস্তুসাপ, এবার মুঙ্গেরি গাদাবন্দুকটি তুলে রাখার পালা। ও জিনিস আর কোনওদিনই কাজে লাগবে না, নিশ্চিত।

আমার নামের মাঝখানটিতে একটি দু'অক্ষরী মধ্যনাম ছিল বাল্যকাল থেকে। শৈশবের সাক্ষরতা অভিযানে, গোটা গোটা করে নিজের নাম লিখতে শিখেছিলাম স্লেটে—অনিন্দ্যনাথ চট্টোপাধ্যায়। মধ্যনামটি নিয়ে বন্ধুরা পিছনে লাগত, যেমন লেগে থাকে আর কী! ইংরেজি ইনিশিয়ালে যেমন কায়দা মেরে লিখতাম এ এন সি, বাংলাতেও আর একটু খেলিয়ে—অ. নাথ। মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ডের পর আর কখনও কোথাও মধ্যনামটি লিখিনি। আমার জীবন থেকে সে দূরে সরে গিয়েছে। ফেলে আসা আরও অন্য অনেক কিছুর মতোই, তাকেও আমি অনাথ করে দিয়েছি কবে।


ছোট, বড় সবার।
সব occasion-এর জন্য বিশাল সম্ভার।
আর দাম, পুরোপুরি সাধ্যের মধ্যেই।
Sreeleathers
KANVAZ
ফ্যাশন দুনিয়ার নতুন প্যাশন
06013
Rs 390/-
Genesis 2877
Sreeleathers
বিশ্বমান। খাঁটি দাম।
Lindsay Street (033) 22861510/11 Free School Street (033) 22861506

রো ব বা রে র ক্র ম শ

অষ্টম গর্ভ

বাণী বসু

দ্বিতীয় অধ্যায়

জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া

বিয়ে হয়ে পমপমদিদি চলে গেলেও বেশ থেকেও গেল। আমাদের খুব বেশি পমপমবিরহ সহ্য করতে হল না। শাসনে পালনে পমপমদিদি সেই এক জায়গাতেই খাড়া রয়ে গেল। আমরাও নিশ্চিন্ত। এ সপ্তাহ যদি সে শ্বশুরবাড়ি যায়, তো দু-সপ্তাহ পরেই আবার জামাইবাবু হইহই করতে করতে পমপমকে নিয়ে এসে পড়েন। এসেই বিরাট একটা চিৎকার দেবেন জামাইবাবু—আমার শালা-শালির টিম কোথায় গেল? যে যেখানে আছ যেমন অবস্থায় আছ চলে এসো, চলে এসো, এমন মজা আর চট করে পাচ্ছ না।

মজা না থাকলেও অবশ্যই আমরা হাজির হব, যে যেখানে আছি, যেমন আছি। কারণ তিনি আমাদের খুবই কৌতূহলের বস্তু, তারপরে তিনি মহা মজার মানুষও। সন্ধেবেলায় তখন সবাই এসে গিয়েছি, হয়তো সু-দাদা নেই। অংশু হয়তো এইমাত্র ফিরল, আমরা বড় ঘরে জামাইবাবুকে ঘিরে গোল হয়ে বসব, উনি চেয়ারে, আমরা খাটে। একটার পর একটা ম্যাজিক দেখাবেন উনি। টমদিদি খাবার আনবে, পমদিদিকে দেখা যাবে না।

ম্যাজিক ১। পকেট থেকে বেশ কিছু পয়সা টাকা বার করে উনি সামনে ছড়িয়ে দেবেন—নাও হে বুবুরানি যেটা ইচ্ছে নাও, খুব শক্ত করে পছন্দের পয়সাটা ধরে থাকো যতক্ষণ আমি ষাট গুনি, এই অংশু আমার চোখ ভাল করে টিপে থাক তো, এদের আবার সন্দেহবাতিক। বুঝলে বুবু তারপরে অন্য পয়সার সঙ্গে তোমারটা মিশিয়ে দেবে। আমি তখন তোমার পছন্দের পয়সাটা পুরস্কার দেব।

সত্যি সত্যি পয়সাটা খুঁজে বার করবেন উনি, একটা মন্ত্র বলবেন হিং বিং করে, ব্যস পয়সা মিলে যাবে।

অংশু মিটমিট করে হাসবে, পুটপুটের দিকে তাকাবে, পুটপুটও হাসবে।

—হাসছ কেন হে?

—ওঃ রথিনদা, আমিও কিছু কিছু ম্যাজিক জানি।

পুনপুন সরু গলায় বলবে—এ তো সোজা। সবাই জানে বুবু ঠিক দুখুর মতো। ও সবচেয়ে কম পয়সাটা নেবে, তাই।

ব্যস, হইহই শুরু হয়ে যাবে। রথিনদা বললেন—দুখু কে? সুখু দুখুর গল্প ধরিয়ে দিলে চোখ গোল করে বললেন—বুবুরানি, তোমাকে আর দুখুর মতো নাম কিনতে হবে না, যত্ত বোকামি! ক'দিন আর এই জীবন! ভাল করে সব আনন্দ করে নাও। আমি মোটেই তোমাকে এক নয়াটা দেব না, তুমি আধুলিটা নাও আর খুব করে ফুচকা খাও।

মোট কথা জামাইবাবু আমাদের বেশ পছন্দের মানুষ হয়ে উঠছিলেন। আমরা বেশ তৈরি হয়ে গিয়েছিলুম এবার একদিন পমদিদি আমাদের ভাগনে বা ভাগনি হয়ে ঢুকবে। তখন আর আমাদের পায় কে? আমাদের চেয়েও ছোট একটা শিশুকে চটকাবার তালে আমরা হাঁকপাঁক করছিলুম। কিন্তু পমদিদি একদিন যাঁকে নিয়ে ঢুকল তাঁর এক মুখ গোঁফ দাড়ি, গম্ভীর গলা, ফরসা, বেশ জোয়ান মতো। বেবি ট্যাকসি করে এলেন। সাধু আমরা অনেক দেখেছি, রাস্তায়-ঘাটে, ফোটোতে। কিন্তু এমন সামনাসামনি? একেবারে হকচকিয়ে যাই। একদিন এলেন একা একা, পমদিদির সঙ্গে, তারপর মাঝে মাঝেই দু-তিনজন করে লোক নিয়ে, তাদের বলে শিষ্য। আমরা জানতুম শুধু তপোবনেই শিষ্য থাকে, কলকাতা শহরেও থাকে দেখে আমরা অবাক। এসেই তিনি বাবার সঙ্গে কথা বলবেন, সূর্য থাকবে, টম থাকবে, ই-দাদাও, বাপ রে!

কাঁধ অবধি কাঁচা পাকা চুল, একটু কোঁকড়ামতো। লম্বা-চওড়া। শাঁখের মতো গলার আওয়াজ। হাসেন যখন বাড়ি গমগম করে, গান মানে ভজন করেন, সবাই বলে খুব ভাল, কিন্তু আমাদের ভাল লাগে না, কেমন ভয় ভয় লাগে। আমি আর পুনপুন আলোচনা করে স্থির করি, গান আর ভজন আলাদা জিনিস। গান ভাল, ভজন বাজে। উনি এলেই সঙ্গে আসে ওঁর শিষ্যসামন্তের দল। মা, পিসিমা খাটতে খাটতে সারা হয়ে যান।

ইনি নাকি রথিন জ্যাঠামশাইদের বাড়ির গুরুদেব। জামাইবাবুর বাবা-মা নাকি এঁরই কাছে দীক্ষা নিয়েছেন। বিয়ের পরই জামাইবাবু আর পমদিদিকেও দীক্ষা দিয়েছেন। জামাইবাবুর বাবা জগদীশ জ্যাঠামশাই-ই বাবাকে একদিন বলেছিলেন—আপনারাও দীক্ষাটা নিয়ে নিন বেয়াইমশাই। প্রথম পুত্র চাকরিতে ঢুকে গিয়েছে, প্রথমা কন্যার বিবাহ সম্পন্ন, এবার পরকালের চিন্তা করুন। এতদিন পাঁচজনের রোগ সারালেন, এবার নিজেকে ধরুন দেখি! ইনি সত্যিকারের মহাপুরুষ। একবার যদি এ গাছে নৌকা বাঁধতে পারেন চোদ্দ পুরুষের কাজ হয়ে যাবে মশাই।

দীক্ষা কী? কেন যে কুন্তি জেঠু রোজ রোজ আসেন আর বাবাকে এইসব বলেন, বাবা কেমন অন্যমনস্ক হয়ে যান, আমাকে দেখে 'চিত্তবিনোদন' বলেন না আর, বাবার কি কোনও অসুখ হয়েছে? দীক্ষা কি একরকমের চিকিৎসা?

তারপর একদিন বাড়ি খালি করে সবাই চলে গেল। রইলুম খালি পিসিমা, অং-দাদা, আমি আর পুনপুন। বুনবুন মামার বাড়িতে দিদিভাইয়ের কাছে, সে কিচ্ছু জানতে পারল না।

—পিসিমা পিসিমা, মা-রা কোথায় গেলেন?—দু'জনে জিগ্যেস করি।

—জানিনে বাপু, এক মুখপোড়া সাধু এসেছে, সব একধার থেকে গদগদ। ঝেঁটিয়ে দীক্ষা নিতে চলে গেল। পুঁটি ওইটুকুনি তেলপটকা ও দীক্ষার কী বোঝে? ওকে শুদ্ধ...দুগগিটা চিরকালের গোঁয়ারগোবিন্দ। কী যে হবে! পিসিমার চোখ পিটপিট করে।



—আপনি? আপনি দীক্ষা নেবেন না?

—আমি তো সেই কবে থেকেই ভোলাগিরি মহারাজের আশ্রমে দীক্ষিত। দেখিস না জপতপ করি, মালা ঘোরাই? তিনি কি এমনি ফ্যাশনের গুরু না কি? পিসিমা মুখ ঝামটে বলেন।

—আর অং-দাদা?

—সেজখোকাটারই তো একমাত্তর ঘটে কিছু আছে দেখছি। কিছুতে গেল না।

ভয়ে ভয়ে জিগ্যেস করি—আমাদেরও দীক্ষা হবে?

—হলেই হল। আর দু-চার বছর বয়স বাড়ুক! বুনুকে তোর দিদিভাই কিছুতেই নিতে দেবেন না, ওর ভয় নেই, তোরাও না করবি, বেঁকে বসবি একেবারে। এখন থেকে বলে রাখলুম, বুঝলি?

—দীক্ষা হলে কী হয়?

—কাঁচকলা হয়। আমরা হাঁ হয়ে যাই একেবারে।

—দেবে বইকি! কচু আর ঘেঁচু! মাংস ডিম পেঁয়াজ ছুঁতে পাবি না। সাধন না কী মুণ্ডু শুরু করলে মাছ পর্যন্ত বন্ধ। তোদের পমদিদি তো মাছ ছেড়ে দিয়েছে।—পমদিদি করতে পারে না এমন কষ্ট নেই পৃথিবীতে তা আমরা জানি।

—আর জামাইবাবু?

পিসিমা নিশ্চিন্তগলায় বলেন—জামাই হাট্টাকাট্টা লোক। ওকে

কায়দা করবে এমন সাধু এখনও জন্মায়নি। ও সব খায়। বলছিল—এখন মাছ-মাংস-ডিম-পেঁয়াজ ভূরিভোজ করে নিই। দীক্ষা তোলা রইল। বুড়ো বয়সে বৈরাগ্যি হলে তখন সাধন-ফাধন দেখা যাবে। ঠিক কথা বলে। যদি বলো কেন, তো যে বয়সের যা।

আমার মনে হতে লাগল কেউ নেই, কেউ কোথাও নেই আমাদের। বুজবুজদিদি আর পালক চলে গিয়েছে আগেই, ঠাকুমা-ঠাকুরদা ওপরে গিয়েছেন, পমদিদিও গেল। এবার বাবা-মা ই-দাদা সু-দাদা টমদিদি, পুটপুটদিদি সব চলে যাচ্ছে। আছে শুধু পুনপুন, আমার চেয়ে ক'মিনিটের ছোট। আমাকেই তো দেখতে হবে ওকে! আর রইল কে? পিসিমা, একমাত্র পিসিমা। মনের কোণে ভয়, পিসিমা কি যথেষ্ট ভরসা? নিজেই তো তিনি ফরসা ন্যাড়ামুন্ডি বৃদ্ধা এক। রান্না করে দিতে পারেন, দীক্ষা না নেওয়ার উপদেশ দিতেও পারেন। কিন্তু আরও তো অনেকরকম আছে, ভাবতে পারছি না আর। কী যে অন্ধকার নেমে আসছে। ভাল করে দেখতে পাচ্ছি না চোখে। বুকের মধ্যে ধকধক করছে। আস্তে আস্তে অং-দাদার কাছে যাই। অং-দাদা উদাস মুখে বসে আছে চেয়ারে। টেবিলে খোলা খাতা কলম। আধখানা আঁক কষা তাতে।

—অং-দাদা,

—কী?

—আমায় একটু অংক দেখিয়ে দেবে?

—রোববারের সকালে তুই কবে থেকে অংক ধরলি?

হঠাৎ আমি ভ্যাঁক করে কেঁদে ফেলি।

—কী হল আবার? কাঁদছিস কেন? আমি কি তোকে বকেছি?

আমার কান্না থামে না।

পুনপুন অবলীলায় বলে দেয়—ওর মা-বাবাদের জন্যে মন কেমন করছে।

—তাই বলো—অং-দাদা একটু কোমল হয়—কাঁদার কিছু নেই। কী সব মন্ত্র-তন্ত্র নিতে গিয়েছেন। হয়ে গেলেই ফিরে আসবেন। আমি চোখ মুছছি, অং-দাদা বলল—মা তোকে কিছু বলে যাননি?

—না।

—পুটপুট?

—না।

অং-দাদা হঠাৎ গোপন কথা বলার মতো করে ঝুঁকে এল, গলা নামিয়ে বলল—এই পুনপুন শোন, বুবু শোন, যার খুশি নিক্‌গে যাক, আমিও নেবো না, তোরাও ও সব নিবি না। মন্ত্র কী জানিস? এইগুলো—অং-দাদা বইগুলো খাতাগুলো দেখায়। বলে শিখতে হবে বিজ্ঞান। সারা পৃথিবীর বড় বড় মাথারা কত কিছু আবিষ্কার করেছেন, উদভাবন করেছেন, সে সব পড়ে রইল, আর বড়দা মেজদা ছোড়দি চলল দীক্ষা নিতে। কী? না ভবগান লাভ হবে। হুঁ, দেখে রাখ পুনপুন, এই বইগুলোর মধ্যে আসল ভগবান আছেন। তার জন্যে হুঁ হুঁ করে মন্ত্র জপ করলেই হয় না, আর ভ্যাঁ ভ্যাঁ করে ভজন গাইলেই হয় না। পড়তে হয়, বুঝতে হয়, প্র্যাকটিস করতে হয়।

অং-দাদা চিরকাল অল্প কথার মানুষ। তার তেমন জোর আছে বলেও আমরা জানতুম না। এই সে দিনও মা কিংবা বাবার কাছে বকুনি খেয়ে নিঃশব্দে মুঠো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চোখের জল মুছেছে। ভেতরের ভয়টা একটু একটু করে কমে যাচ্ছে।

বলি—অং-দাদা, আমি তুমি পুনপুন আর পিসিমা বেশ এক দলে।

—হ্যাঁ, আর সবাই অন্য দলে, ভুল দলে।

পুনপুন বলে উঠল—দল আমার ভাল লাগে না। আমি মার কাছে থাকব, বাবার কাছেও।

—থাকতে তোকে কে বারণ করেছে? মন্ত্র-তন্ত্র নিতে বললে



নিবি না, ব্যস।

—যদি মা-বাবা কথা না বলেন? রাগ করেন? তা হলে মন্ত্রও নেব।

আমার মনের কথাটাও অনেকটা তাই-ই। কিন্তু গুরুঠাকুরের গলার স্বর আর কাঁচাপাকা দাড়ির কথা মনে পড়ে ভয়ে আমার প্রাণ উড়ে যাচ্ছে।

বেলা দু'টোর সময়ে ফিরল সবাই। আমাদের তিনজনকেই পিসিমা খাইয়ে দিয়েছেন। ঢুল আসছে কেমন বসে বসে। কিন্তু কীসের ভয়ে যেন জেগে বসে আছি। অং-দাদা একটা শার্ট গলাল, ঢোলা মতন ফুল প্যান্ট পরে নিল, ওরা ফেরবা মাত্রই বলে উঠল—মা আমি একটু অনিমেষের কাছে যাচ্ছি।

ওদের মুখগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখি। ফিরে এসেছে তো? কীরকম পুজো পুজো গন্ধ বেরচ্ছে ওদের গা দিয়ে। চন্দনের গন্ধ, প্রসাদের ফলমূলের গন্ধ, বাবার মুখটা কী অদ্ভুত হাসি ভরা! এমন তো কখনও দেখিনি। মা চুপচাপ। কিন্তু পুটপুট ছাড়া আর



কোনও দাদা দিদিই আর আগের দাদা দিদি নেই। সব কেমন চোখের তারা ওপর দিকে হয়ে রয়েছে। মুখে স্নিগ্ধ হাসি। কিন্তু সেই হাসির কোনও লক্ষ্য নেই। ওরা কি সব দেবদেবী হয়ে গেল?

পিসিমা বললেন—নাও এবার খেয়ে সব আমায় উদ্ধার করো।

মা বললেন—আপনি খেয়ে নিলেন না কেন দিদিমণি?

—কোনওদিন যা করিনি, ঘাটের দিকে পা, এখন আর পারব না তা যদি বলো।

বাবা হেসে বললেন—খুব রেগেছে দিদিমণি। যা তোরা রেডি হয়ে আয়। আমাদের আজ হবিষ্যান্ন, মনে আছে তো?

—অতশত জানি না, পিসিমা ঝংকার দিয়ে উঠলেন, নিরমিষ্যি ভাতে ভাত করেছি। তোমাদের যা বিবেচনা হয় করো। খাওয়া-দাওয়া শেষ হয়ে গেল মহা শুচিতার সঙ্গে। খেতে খেতে কেউ কথা বলল না। আমরা দু'জনে ঠায় বসে। খেলা না, গল্পের বই না, ওদের মুখের দিকে চেয়ে গুটিসুটি হয়ে বসে আছি।

খাওয়ার পর পমদিদি বলল—কী বলেছিলুম? এখন বুঝছেন তো?

মা আস্তে বললেন—করে ফেললে একটা কাজ হুট করে। এখন শেষ রক্ষা করতে পারবে কি না তাই ভাবো।

বাবা বললেন—ভাবার কিছু নেই। সব ভাবনা গুরুতে অর্পণ করেছি।

পরে পুটপুটদিদির সঙ্গে আমাদের বিশদ আলোচনা হয়। ওখানে নাকি আলপনায় আলপনায় চন্দনে চন্দনে ভীষণ পবিত্র ঠাকুরঘর। হোম হল। তামার ট্রে-তে বেলকাঠ দিয়ে, ঘি দিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়া হল আর মন্ত্র পড়তে পড়তে তাতে আহুতি দেওয়া হল। খুব সুগন্ধ ধোঁয়া, কিন্তু ভীষণ চোখ জ্বালা করেছে। তারা প্রত্যেকে হাতে ফুল নিয়ে একজন ছবির ঠাকুরের পায়ে অঞ্জলি দিয়েছে। তাঁর নাম বরদানন্দ ব্রহ্মচারী। তারপরে

প্রত্যেকের কানে মন্ত্র দিয়েছেন গুরুদেব।

—কী মন্ত্র? আমরা হুমড়ি খেয়ে পড়ি।

—বলতে নেই।

—বললে কী হয়?

—সর্বনাশ হয়। যে বলে তার, যে শোনে তারও।

অং-দাদা বললে—রাবিশ।

—খাতায় শুধু আঙুল দিয়ে গীতার শ্লোক লিখে দিলেন রে! সর্বধর্মান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। কেমন একটা ঘোরের মধ্যে ছিলুম বুঝলি অং-দাদা! যেন কোথাও কোনও ভাবনা-চিন্তা নেই। কীরকম একটা শান্তি।

—পরীক্ষা এগিয়ে এলে যখন ভাবনা-চিন্তাগুলো আসতে শুরু করবে, তখন আমার কাছে আসিস!

—নারে! গুরুদেব বলেছেন—তোমরা এখন ছাত্র। তোমাদের প্রথম কর্তব্য পড়াশোনা। পড়াশোনার ক্ষতি করে কিছু করবে না। ঋতির শুধু দু'বেলা নাম জপ করলেই হবে। আর জানিস তো, উনি বলছিলেন আমাদের প্রত্যেকের নাম খুব সুন্দর। আমরা নাকি ভগবৎ সাধনার জন্যই নির্বাচিত।

—তাই বুঝি? তা হলে সাধনটা আরম্ভ করে দে।

—আহা! বললুম-ই তো, ছাত্রাণাম অধ্যয়নং তপঃ, বলেছেন বারবার।

—ভগবানই যদি পেয়ে যাস তা হলে লেখাপড়ার আর দরকার কী থাকছে?

তেতলার ওপর যে ঘরটায় তিন দিদি ছাত্রাণাম অধ্যয়নং তপঃ করে সেইখানে অতএব রোজ ব্রাহ্মমুহূর্তে দরজা বন্ধ হয়ে যায়, সন্ধেবেলায় পুজোর পর আরেকবার। মা আর পুটপুট বাদে আর সবাই ঘরটায় সাধন ভজন করে। আমাদের তেতলায় ওঠাই বারণ।

—মা, তুমি সাধন ভজন করবে না?

মা উদাস মুখে চুপ করে থাকেন। প্রশ্নটা দ্বিতীয়বার করার পরে আস্তে করে বলেন—আমার ও সব পুণ্য কাজ করার সময় কই? মায়ের একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে।

কেন মায়ের দুঃখ, কেন অভিমান, কেন দীর্ঘশ্বাস? পুণ্যকাজ করার সময় নেই বলে? উত্তর পাই না। তারপর মাঝরাত্তিরে একদিন জীবনে এই প্রথম মা-বাবার কথা কাটাকাটি শুনি।

বাবা—তুমি কিন্তু একদিনও প্রাণায়ামে আসছ না।

মা—সংসারটা দিদিমণির হাতে ছেড়ে দিয়ে ছাতের ঘরে বসে থাকলে পুণ্য হবে?

বাবা—আরে ও সব তো আছেই। সংসার যাত্রা বলে। এ সবের উর্ধ্বে ওঠার জন্যেই তো মানুষের জন্ম।

মা—সংসার যাত্রাটা যখন কপালে শুরু হয়েই গিয়েছে তখন সংসারের সুখ-সুবিধে দেখাটাই আমার প্রাণায়াম। তোমরা পারলে জীবনমুক্ত হও, আমার আর এ জন্মে হল না।

—সন্ধেবেলাও হয় না?

—ওই অতগুলো ময়দা কে করবে? দিদিমণি একা? তারপরে তরকারিপাতি।

—সিম্পলিফাই করো, সিম্পলিফাই করো।

—সিম্পলিফাই? ছোট তিনজন মুসুর ডাল ছাড়া খাবে না। দিদিমণি মুসুর ডাল খান না। বিউলির ডাল হলে একজনের সাদা, একজনের হলুদ দেওয়া, একজন হিং ছাড়া কিন্তু ফোড়ন দেওয়া, আর একজনের ফোড়ন নয়, কিন্তু হিং থাকবে। পারবে? শুধু মনে রাখতে পারবে? বিকেলবেলা সব কলেজ-স্কুল করে ফিরবে, পেটে খাঁইখাঁই খিদে নিয়ে। তখন তাদের শূন্য থালা ধরিয়ে দিয়ে প্রাণায়াম করতে যাব?

—উঃ, এত যদি তোমার অসুবিধে অপছন্দ, তখন প্রথমে বললে না কেন?

—বলেছিলুম বইকি! তা তুমি আমার কথা শোনার মানুষ? ঋদ্ধি বলল তো ইন্দ্রও বলল, বড় দুই ছেলেমেয়ে বললে তুমি আর কারও কথা গ্রাহ্য করো? আমি কে? আমি খালি ওদের জন্ম দিয়েছি, বড় করে তুলেছি। ওদের মতো বিদ্যে সাধ্যি তো আমার নেই!

—এতকাল পরে তুমি বিদ্যে নিয়ে খোঁটা দিলে আমায়?

—খোঁটা নয়, তুমি এ দিকটা ভাবো! কোনওদিনই তো ভাবলে না। এখন যদি শেষরক্ষা করতে না পারি, তা হলে ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যৎ কী? তুমি এত বিদ্বান বুদ্ধিমান লোক হয়ে যদি বলো রোজ দু'বেলা প্রাণায়াম করলেই ভগবান লাভ হয়ে যাবে, খেতে পরতে লেখাপড়া করতে আয়ব্যয় করতে হবে না, তবে হালটা আমাকেই ধরতে হয়।

—ঋতি অংশুর ছোট, সে নিলে, অংশু গোঁজ হয়ে রইল। তুমি নিলে কিন্তু পালন করছ না। মন্ত্র কি হেলার জিনিস?

—ঋতি অংশুর কথা যদি বলো আমার একেবারে ইচ্ছে ছিল না ওদের এ সবের মধ্যে টানা। কিন্তু এটাও জেনো, অংশুর মাথায় আমি কিছু ঢোকাতে চাই না। আমার সব ছেলেমেয়ের মধ্যে আমি তো দেখছি অংশুই সবচেয়ে বুদ্ধিমান। যাকে বলে প্র্যাকটিকাল, যোগ্য ছেলে। আমার কথা যদি শোনো তো ভবিষ্যতেও ওর ওপর জোর খাটাতে যেও না। একটা সন্তানকে মায়ের গলা কান্নায় ভারি হয়ে এসেছে। আমরা প্রাণপণে চোখ বুজে কাঠের মতো শুয়ে আছি। কিন্তু মাকে কাঁদতে শুনে আমাদেরও ভেতরে কান্না ঘনিয়ে এসেছে।

—কী বলছ তুমি? দশ দশটা সন্তান তোমার!

—হতে পারে। কিন্তু ছোট ক'টা ছাড়া আমার কেউ নেই। আর এখন আমার তুমিও নেই।

—বলছ কী?

—সারাটা জীবন একরকম কষ্ট দিয়েছ, এখন আরেক রকম ধরেছ।

—মেনে নিলুম। কিন্তু এর মধ্যে যে গভীর শান্তি আছে, আমি তোমাকে সেটাই দিতে চাই।

—আমার শান্তির দরকার নেই গো। আমি শান্তি সার করে হাত পা গুটিয়ে থাকলে ছেলেমেয়েগুলো ভেসে যাবে। আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল এক বিশাল পারাবার, আমরা সবগুলি ভাইবোন ভেসে যাচ্ছি, বাঁচাও বাঁচাও, বাবা তীরে দাঁড়িয়ে আছেন হাসি হাসি শান্তি শান্তি মুখে, মা ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন।

পুনপুন কেমন ফুঁপিয়ে উঠল। আমার ঠোঁট ফুলে ফুলে উঠছে। কিন্তু আওয়াজ বেরচ্ছে না। আমি হাঁ হাঁ করে কাঁদতে পারি, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে পারি, আবার শব্দ আটকেও কাঁদতে পারি। কান্নার নানান ভ্যারাইটি আমার। আপাতত ঠোঁট ফুলছে, চোখ দিয়ে ধারা বইছে, কিন্তু শব্দ নেই।

—কী হল পাবন? মা পুনপুনের ওপর ঝুঁকে পড়েছেন।

—ভূত...

—ভূত? স্বপ্ন দেখেছ?

—হুঁ।

—আচ্ছা আর স্বপ্ন দেখতে হবে না, এবার ঘুমোও। মা পুনপুনের পিঠে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। বাবা চুপ। আমি চুপ। কত ভূত আসা যাওয়া করছে। করবেই। সবচেয়ে বড় ভয় মা হারানো বাবা হারানো। এই সব ভয় ভূতের রূপ ধরে চারদিকে ছায়া হয়ে ছড়িয়ে ছড়িয়ে যাচ্ছে। ছড়িয়ে আছে সারা ছোটবেলা ধরে। জীবনের নশ্বরতা, প্রিয়জনদের বিরহ, তাদের পাল্টে পাল্টে যাওয়া, এই সব ভূত এইসব ভুয়োদর্শন। এড়াতে চাইলে পারব কেন?

(ক্রমশ)

ছবি : ঈলীনা বণিক


ছোট, বড় সবার।
সব occasion-এর জন্য বিশাল সম্ভার।
আর দাম, পুরোপুরি সাধ্যের মধ্যেই।
Sreeleathers
KANVAZ
ফ্যাশন দুনিয়ার নতুন প্যাশন
06004
Rs 390/-
Genesis 2876
Sreeleathers
বিশ্বমান। খাঁটি দাম।
Lindsay Street (033) 22861510/11 Free School Street (033) 22861506

র‍্যান্ডম, যায়িচ্ছে, ভাবনা লোফালুফি

বেড়াতে যাচ্ছি, গাড়ি হু-হু ছুটছে, হঠাৎ এক বন্ধু বলে উঠল, এঃহে! মাছগুলোকে খেতে দেবে কে? ব্যবস্থা করে তো এলাম না! আমরা অবাক। তুই অ্যাকোয়ারিয়াম কিনলি কবে? বন্ধু বলল, না না, অ্যাকোয়ারিয়াম কীসের? এরা হল গিয়ে ভার্চুয়াল মাছ। মানে! পুঁটি ইয়েস, ট্যাংরা ইয়েস, কিন্তু ভার্চুয়াল ফিশ! হোয়াট ইজ দিস? রহস্য প্রকাশিত হতে হাঁ গভীরতর। মাছ নয়, উহারা যেন-মাছ, প্রায়-মাছ, ছবি-মাছ, কম্পিউটারে কোন সাইটে না কোথায় গিয়ে সে এদের পুষেছে, তাদের খেতে দিতে হয়, দেখভাল করতে হয়, জল বদলাতে হয়, অ্যাকোয়ারিয়াম পরিষ্কার করতে হয়, সব ওই মাউস ক্লিক করে করে! খেতে না পেলে ওই ছবির মাছেরা সত্যি মাছের মতো উল্টে মরে ভেসে থাকে, তখন দুঃখু হয়, পয়েন্ট কাটা যায়, অন্য খেলোয়াড়ের হাতে-পায়ে ধরে তাদের বাঁচিয়ে দেওয়ার আর্জি জানাতে হয়। এসব হাবিজাবি শুনে সব্বার চক্ষু চড়কগাছ। যে মাছের অস্তিত্ব নেই, তাকে পোষাই বা কেন, এত হ্যাপা পোয়ানোই বা কীসের! আমাদের খ্যা-খ্যা হাসি দেখে তার কী রাগ! প্রিয়জনের লকেটের মতো নতুনতম শখকে বিদ্রুপের হাত থেকে বাঁচাতে লাগল। এবং সত্যিই, পাগলের মতো একে-তাকে ফোন করে ব্যবস্থাও করে ফেলল, কে তার অ্যাকাউন্টে ঢুকে এই দু'দিন ধরে মাছকে খেতে দেবে, এতে তার ক'পয়েন্ট হবে, পরে একদিন এ ওর ময়লা জল সাফ করে ফেভার শোধ করবে কি না।

ব্যাপার বিচ্ছিন্ন নয়। এই ধাঁচের খেলা এমুহূর্তে দুনিয়া জুড়ে সুপার-ডুপার-লুপার। পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে টেবিলে ল্যাপে ঘরের কোনায় এ মাছ চাষ করছে, ও ভেড়ার উলে বিলি কাটছে, সে বাগান করতে গিয়ে চোখে বোগেনভিলিয়া দেখছে। সব্বাই 'দেখি তো জিনিসটা খেলে একবার, এত রইরই যখন' বলে একবার যেই সম্মোহনদুয়ার দিয়ে ঢুকে পড়ছে, ব্যস, আর আঠা ছাড়াতে পারছে না। কিন্তু খাড়াও ক্ষণকাল, আমরা খেলা বলতে ঠিক এরম জিনিস বুঝি কি? খেলা মানে কী? সাঁইসাঁই, ঠাঁইঠাঁই, হো-হা, হুড়ুদ্দুম। অ্যাড্রিনালিন, দ্রুত নাড়ি। যেখানে কতকগুলো নিয়মের মধ্যে থেকে, যথাসম্ভব কৌশল বাগিয়ে, তুমি প্রতিদ্বন্দ্বীকে কিলিয়ে কাঁটাল পাকিয়ে দেবে ও ট্রফি তুলে আনন্দে লাফাবে। মাথা চলবে, রিফ্লেক্স চলবে, চোখ চলবে স্যাটাস্যাট। ভিডিও গেম-টেমও আগে তো অন্যরকম হত। আগুন এড়াও, হুউশ ধেয়ে আসা কুঠার থেকে মাথা বাঁচাও, গর্ত পেরোও, শেষমেশ পেল্লায় দৈত্য নিকেশ করে, শান্তি। কিংবা ধরা যাক, গাড়ি চলতে শুরু করল, প্রথমটা মসৃণ পথঘাট, তারপর ক্রমে বিপজ্জনক বাঁক, চড়াই উতরাই, হুট করে প্রচণ্ড স্পিডে উল্টোবাগে ধেয়ে আসা বদরাগি গাড়ি, হাইওয়ের মাঝখানে চমকে-চিত্র মুরগিছানা, একশো ঘাঁতঘোঁত টপকে ফিনিশিং লাইন। কিংবা বোমারু প্লেন চালিয়ে মারতে হল শত্রুবিমান, বা সাবমেরিন চড়ে ডজ করলাম খতরনাক হাঙর-রাশি, বা বারোটা তীর শনশন চালিয়ে বিঁধে দিলাম খানচল্লিশ বেলুন। সোজা কথা : যে কোনও খেলার মতোই, কম্পিউটারের খেলাতেও, আমরা জানতাম, মূল ধর্ম একই : একটা চটজলদি টার্গেট থাকবে, আর অনেকগুলো বাধা থাকবে, সব বাধা এড়িয়ে লক্ষ্যে পৌঁছতে হবে। পারলে জিত, নইলে হার।

এসব খেলা আমরা খেলতাম কেন? সহজ উত্তর, ধুমাধাড় অ্যাডভেঞ্চার। পর্দায় শনশন সরছে জঙ্গল বা পাথুরে টেক্সাস, আছড়াচ্ছে তিনতলা ঢেউ, ঝলসে উঠছে বন্দি রাজকন্যার প্রাসাদ আর গুপ্তধনের গুমগুমে গুহা, এ অডিও-ভিসুয়াল কাণ্ড আমাদের নিয়ে ফেলত রূপকথার চ্যাপটারে, এবং সঙ্গে ছুড়ে দিত দুরন্ত চ্যালেঞ্জ। সত্যি সত্যি তো আর গাড়ির রেস-এ নাম লিখিয়ে বিদ্যুৎস্পিডে ড্রাইভ করব না কোনওদিন, হাঁ-করা খাদের এদিক থেকে ওদিক প্রাণ হাতে করে লংজাম্প-ও দেব না, এমনকী একটা বাটিতে ডিম নিয়ে আরেকটা বাটির দিকে সেটা ছুড়ে দেওয়ার মকশো করলেও বাড়ি থেকে বের করে দেবে। তবে সেই সব ইচ্ছাপূরণের আবহাওয়ার চেয়েও অনেক বড়: স্কোর করার মাদকতা। জিতে যাওয়ার আনন্দ। কাউকে দাবড়ে হারিয়ে দেওয়ার থ্রিল। যে জন্য লোকে খেলাধুলো করে, করে এসেছে। কম্পিউটারের আরেক সুবিধে, সে হেরে গেলে প্যাঁক দেয় না, উঠতে-বসতে চিমটি কাটে না। ফলে নো পরোয়া, পরমুহূর্তে ফের খ্যালো। তারপর আবার। নিজে রেকর্ড গড়ব, নিজেই ভাঙব, স্ক্রিনে যেই লেখা হবে 'ইউ উইন', নিজের পিঠ সবেগে থাবড়ে ইগো-মালিশ তারিয়ে চাখব। আমাদের জীবন তো নানা পরাজয়ে ভর্তি। প্রতি মুহূর্তে শুধু কী-হতে-পারত ভেবে দীর্ঘশ্বাস কপাকপ গিলে চলা। আর বিচ্ছিরি অটোওলা, অভদ্র বস, বড়লোক বন্ধু। এবং প্রতিটি দিন ঘটনাহীন, পানসে। তা হলে জীবনে না-থাকা উত্তেজনা আর জেতার থরথর কে জোগান দিতে পারে? হিন্দি সিনেমার লাস্ট সিনে ঝাড়পিটরত হিরো আর রকমারি লম্ফঝম্প খেলা ছাড়া? তাই আমরা রোজ বিকেলে যেমন বল বগলে খেলতে যেতাম, এখন অফিসের কাজ ফাঁকি দিয়ে কম্পিউটারে বসে যাই। ফনফনে প্লাস্টিকের কাপে কফি চুমুক মারতে মারতে মহাকাশযানের স্টিয়ারিং ধরে নিজেকে অতিমানব ভাবি, উল্কাপিণ্ডগুলোকে গুঁড়ো করে দেওয়ার জন্য উদ্যত কামান ও ভিলেনীয় মুচকি শানাই।

কিন্তু বাঁধাকপি চাষ তা হলে পৃথিবী কাঁপিয়ে দিচ্ছে কেন? আজ লক্ষ কাল কোটি মানুষ জগৎ জুড়ে এসব বখেড়ায় সামিল হয়ে নিজেদের ধন্য মনে করছে কেন? কম্পিউটারের পর্দায় বেড়ালের এঁটুলি সাফ করে তুরীয় পুলক জাগছে কোন পাছদুয়ার দিয়ে? এই খেলাগুলো কী দিচ্ছে, যা অ্যাদ্দিনকার কম্পুক্রীড়াপ্যাটার্ন আমাদের দিতে পারেনি? খেলায় ঢুকেই আপনি পেলেন একটা খামার। প্রথমে ফ্রি দেওয়া হবে দু'টো স্ট্রবেরি খেত আর দু'টো বেগুন খেত। তার স্ট্রবেরি আর বেগুন বেচে আপনি পেলেন কিছু পয়সা। তাই দিয়ে কিনে ফেললেন দিশি পটল আর মুসুর ডালের বীজ। তারপর খবর দিলেন আপনার ছ'টা বন্ধুকে, যারা এই খেলায় জীবন নিবেদন করে দিয়েছে। তারা আপনার প্রতিবেশী হয়ে উপহার দিয়ে গেল একখান গরু আর একপিস হাতি। এই গরুর দুধ আর হাতির নাদ বেচে পেলেন ফের পয়সা। তারপর আপনার দুই ভুরুর মাঝখানে এসে সবেগে গেঁথে গেল ব্যক্তিগত কৃষিসমস্যা। রাতের বালিশে মাথা রেখে ঢুলুনি এসেছে না-এসেছে, চটকা ভেঙে মনে পড়ে গেল, ছ'ঘণ্টা বাদে পাকবে দু'ছড়া কলা। তক্ষুনি তাদের পেড়ে ফেলতে হবে। আপনি মোবাইলে অ্যালার্ম দিয়ে রাখলেন। পাশ ফিরতেই ওয়াড় বেয়ে পিলপিল করে উঠে এল পুকুরে চাট্টি ডিমওলা কচ্ছপ ছেড়ে দেওয়ার সুচারু মতলব। বাথরুমে বসতেই মনে হল গাজরের দর তো এবার চড়বে বলে মনে হচ্ছে, তা হলে মার্কেটে গিয়ে তার ব্যাপারগুলো খতিয়ে দেখতে ভুললাম কী আক্কেলে? অথবা আপনি কাফে খুলে বসলেন। আদর্শ কম্পু হোটেল। প্রথমে দু'টো স্টোভ দিয়ে আপনার বিড়লাগিরি শুরু। কাফে-তে ক্রমাগত লোক ঢোকে, তিনটে মাত্তর টেবিলে খায়দায় আর আপনাকে পয়েন্ট দেয়। কিছু টাকা হাতে আসতে, যখন সবাই ভাবছে আপনি সিওর আরও খানচারেক স্টোভ বাগাবেন, আর মেনুতে জুড়বেন চিকেন তন্দুর, আপনি উল্টে মেঝেয়



লাগালেন ঝক্কাস-মক্কাস মাল্টিরং, আর ফিট করলেন গাবদা তাকধাঁধানো সাউন্ড সিস্টেম। হেপ লোকজন এমন পিলপিল করতে লাগল আপনার কাফেময়, এখন গুচ্ছের লোক লাইন দিয়ে অপেক্ষা করে। শনিবার আপনি লড়িয়ে দিলেন একটি স্পাইক-করা প্রায়-ন্যাড়া ডি-জে, আর দু'টো সুন্দরী ওয়েট্রেস। কিংবা ধরা যাক, স্থাপন করেছেন ইয়াব্বড় চিড়িয়াখানা। তিরিশটা জেব্রা কিনেছেন, কিন্তু জেব্রার খাঁচা গড়েছেন সাইবেরিয়ান বাঘের ঠিক পাশে। রাত্তিরে বাঘের গর্জনে জেব্রার পিলে আঁতকে শুকনো, সে বেচারা ঘুমোয় না, রোগা হয়, তার স্ট্রাইপ কমে যেতে থাকে। আপনার অভিজ্ঞতা-অ্যাকাউন্টে পয়েন্ট কাটা যায়, জেব্রার সঙ্গে আপনিও রাত জাগেন।

কী ভাবছেন? এসব আদতে ব্যবসা-রিহার্সাল? সহজে বিনিয়োগ শিক্ষা? পুঁজিবাদের কেতন-উড়াল? আরে না না, আসলি পয়েন্ট মিস করছেন। কুকুর পালবার খেলায় ম-ম করছে চতুর্দিক। তাকে খাওয়াও রে, চান করাও রে, তুরতুরে চিরুনিতে লোম আঁচড়ে দাও, বেড়াতে নিয়ে যাও। আদর করো। দু'পায়ে হাঁটতে শেখাও কিংবা লাল টকটকে বল ছুড়ে দিলে তুরন্ত দৌড়ে এনে দেওয়া। বেড়াল ভি নরম থাবায় লাফালাফি করছে স্ক্রিনে। এবং টাট্টু ঘোড়া। এমনকী উদ্ভট, অ-বাস্তব, কিন্তু স্নেহ-কাড়া নয়া জানোয়ার। কিছু খেলা আছে যেখানে আপনার ক্লিনিকে আসবে শুধু অসুস্থ জন্তুরা। ডানাভাঙা পাখি। তাদের যত্ন করতে হবে, ওষুধ দিতে হবে ঘড়ি ধরে, ধীরে সারিয়ে তুলতে হবে সেবা ও নৈপুণ্যের কম্বিনেশনে। শুধু ডবকা রক্ষিতা প্রতিপালন ছাড়া আর সব ধরনের খেলাই বেরিয়ে গেছে। জাপানে বেশ ক'দিন আগে একটা খেলা জনপ্রিয় হয়েছিল, কম্পিউটারের খেলা নয় অবশ্য, সেখানে পোষ্যকে ঠিকঠাক খেতেটেতে না দিলে তারা ঝিমিয়ে পড়ত, শেষে পটল তুলত। অফিস থেকে ঠিক টাইমে বাড়ি এসে দম-দেওয়া পুতুলকে খাওয়াবার ধুম পড়ে গিয়েছিল। এইসব কম্পুখেলা ওই জিনিসেরই সোদর ভাই। ওই বাঁধাকপি বা গাজর বিক্কিরি হল কি না-হল, টাট্টুকে রেসে নামালেন না দাওয়ার খুঁটিতে বেঁধে রাখলেন, মাছের ডিম পনেরোয় কিনে অ্যাডাল্ট মৎস্য বিশে ঝেড়ে দিতে পারলেন কি না, তার চেয়ে অনেক বড় ব্যাপার হল হৃদয়-ছেয়ে-থাকা এই অনুভূতি : আমার একটা খামার আছে, নিকিয়ে পরিষ্কার তকতকে রেখেছি, স্ব-উদ্যোগে তাকে দৈর্ঘ্যেপ্রস্থে বাড়িয়ে চারধারে দিয়েছি লক্ষ্মীর আলপনা, নিজ পুঁইশাক ফনফনিয়ে বাড়ছে দেখে আমার একটা সার্থকতার শিরশির জাগছে, আমার বেড়াল হয়ে উঠেছে নধর ও চঞ্চল, আমি সারিয়ে তুলেছি বিপন্ন ঠ্যাং-বিকল বাছুরকে, আজ সে সিমুলেটেড দিগন্তে ন্যাজ তুলে হর্ষ-ধাবমান, আমার রেস্তোরাঁ নাম করেছে এবং এখানে না-খেলে সাইবার সমাজে জাত যায়, আমার ভেড়ার খুদে শিঙে হাত বোলাবার কথা আমার মন ছেড়ে যায় না এডিট মিটিং-এর ক্ষণেও। এসব আমারই ব্রেনসন্তান, আমার সাধনার ধন, আমার শ্রমের স্বাক্ষর, আমার যত্নের পুতলি। আমি কিচ্ছু-না থেকে একটা দিব্যি-কিছু গড়ে তুলেছি, লালন করেছি, এবং করে চলেছি। এই যত্নমূলক খেলা-সিরিজ যা দিয়ে বিশ্বজনমন হরণ করেছে, তা এক আশ্চর্য উপাদান : দায়িত্ববোধ।

যে জিনিসের সঙ্গে আমাদের দেখা হয় না কোথাও, ডিকশনারি ছাড়া। মুখে বলি, নিজেকে সবচেয়ে ভালবাসি। কিন্তু নিজের প্রতি কোনও যত্ন সত্যিই আছে আমাদের? নিজের দায়িত্ব নিই, আমরা? যন্ত্রণা সইতে সইতে শেষমেশ একেবারেই না-পেরে দাঁতের ডাক্তারের কাছে যবে যাই, তখন দাঁত তুলে ফেলা ছাড়া আর উপায় নেই। হাঁপানির ডাক্তার বলেছিল তিন মাস

অন্তর চেক করাতে, সাড়ে তিন বছরে সময় করে উঠতে পারিনি। নখগুলো কালো হয়ে যাচ্ছে, ইনফেকশন ছড়িয়ে পড়ছে, তবু পাঁচ মিনিট হেঁটে গিয়ে ওষুধের দোকান থেকে গ্লাভস কিনে আনা আর হয়ে ওঠে না, এদিকে বাসন না-মাজলেও নয়, গৃহবধূর চাঁপা-হাতটার সর্বনাশ হয়ে যায় বছর ঘুরতে না-ঘুরতে। এসব তো মেডিক্যাল ঝামেলা, আমরা কীভাবে নিজেদের প্রতিভাকে, ক্ষমতাকে, আনন্দকে দপ্ধে দপ্ধে টুঁটি টিপে মারি? স্রেফ আলস্য, আর ক্যালাসপনা, আর এমনি-এমনিই জানলার বাইরে চেয়ে শুয়ে থাকার তলায় চাপা দিয়ে? বুঝতে পারছি ঝলকানিটা ভেতরে আছে, বুঝতে পারছি এই আলো-প্রয়োগের চেয়ে বেশি তৃপ্তি আমায় কিছুই দেবে না, বুঝতে পারছি আমিই এতে হয়ে উঠব খ্যাতিমান ও অর্থময়, তবু কত কবিতা আমরা লিখি না শুধু উঠে গিয়ে কাগজ-পেন খুঁজতে হবে এই প্রখর পরিশ্রমের আতঙ্কে? জাস্ট ইংরিজিটুকু শিখে নিলে ব্যক্তিত্ব প্লাস কেরিয়ার আকাশ ফুঁড়ে উঠে যাবে স্পষ্ট বুঝেও, আর দু-একবার এমনকী ফর্ম এনেও, ইংরিজি শেখার ইস্কুলে কেমন কিছুতেই ঢোকা হয় না, বেলা গড়িয়ে যায়? কত লড়াই আমরা লড়ি না, জাস্ট ওয়াক-ওভার দিয়ে দিই, হায়দরাবাদে দুর্ধর্ষ চাকরি পেয়েও ছাড়ি, ক্রিকেটে ফাটাব বুঝেও কেরানিগিরিতে জুতে যাই, নাচের স্যরের বারবার বারণ সত্ত্বেও নাচ ছেড়ে দিয়ে খাটে বসে থাকি, গাড়ল মা গবেট বড়জ্যাঠা গোঁয়ার ছোড়দার সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদি কাঁউকাঁউ অশান্তির মহড়া নেব না বলে? বিরক্তিকর ছেলের সঙ্গেও আমরা বন্ধুত্ব ভাঙি না, মোবাইলে নাম ফুটে ওঠার পর 'আমাকে এবার চার অক্ষরের গালাগাল দেবে' জেনেও বিচ্ছিন্না বউ প্রাক্তন স্বামীর ফোন রিসিভ করে, অবান্তর ও অসহ্য পার্টি হবে জেনেও নিজকাজ কড়িকাঠে তুলে রাত জেগে লোকে দেখন-হাসি প্রদর্শিয়ে আসে, শুধু দৃঢ়ভাবে নিজের জমিতে আমরা দাঁড়াতে শিখি না বলে, নিজেকে সমূলে গড়ে তুলতে শিখি না বলে, নিজের জীবনের যত্ন নেওয়ার শিক্ষাটা পাইনি বলে। নিজের শরীরের দায়িত্ব আমরা নিই না, নিজের মনের দায়িত্ব আমরা নিই না, নিজের প্রতিভার দায়িত্ব আমরা নিই না। সংসার, সন্তান, পোষা গিনিপিগ, কিচ্ছুর দায়িত্ব আমরা যথাযথ নিই না, সব আধাখ্যাঁচড়া, গয়ংগচ্ছ প্যাটার্নে এদিক ওদিক ছেতরে যায়, আকাচা কাপড়ের ডাঁই জমে ওঠে। ল্যাদাডুস ন্যালাখ্যাপা দিন গড়িয়ে যেতে থাকে, মেয়ের নাকটা অপারেশন করিয়ে করিয়ে দেব ভাবতে ভাবতে মরে যাওয়ার সময় এসে যায়, পোষা বেড়ালের বাচ্চাগুলোকে প্যাকিং বাক্সে রেখেছিলাম, কখন লাল পিঁপড়ের দল এসে খেয়ে গেছে বুঝতে পারিনি। চরিতার্থতা কাকে বলে, সার্থকতা কেমন দেখতে, যে কোনও একটা জিনিস সুষ্ঠু সুসম্পাদন কেমনে ঘটে, এ আমাদের কোটি কোটি যাপনের সিলেবাসের সম্পূর্ণ বাইরে। রাত্রে শোওয়ার আগে আড়াই মিনিট দাঁত মাজার প্রতিজ্ঞা আমরা রাখতে পারি না, আর অত কথা কী!

সেই পাঁচড়ায় তুলো দিতে জিনিয়াস-চিন্তকরা বের করেছে এই সাইবার-ক্রীড়াদের। জীবনের না-থাকা দায়িত্ববোধের প্রক্সি দিতে এরা এসে দাঁড়িয়েছে সার বেঁধে। বাচ্চার যত্ন নিতে পারোনি, প্রেমের যত্ন নিতে পারোনি, নিজের বাঁ কব্জিতে কটাং কটাং আওয়াজ হচ্ছে এখনও অর্থোপেডিক দেখানো হল না, ঠিক হ্যায়, পর্দায় এই ছোট্ট বেড়ালটার দায়িত্ব নাও। একে বড় করে তোলো, এই কাফে-টাকে দাঁড় করাও, এই কৃষিক্ষেত্র একা তদারকি করে জান লড়িয়ে সুফলাং করো, নতুন করে শুরু করো একটা কিছু, তোমার এই ল্যাতল্যাতে দৈনন্দিনে। এর জন্য ভাবো, নিয়ম করে সময় দাও, প্রতিদিন চেষ্টা জারি রাখো। অন্য খেলার মতো এ জিনিস শুরু হয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই শেষ হয়ে যায় না। জীবনের মতো, চলতেই থাকে। জীবনের মতোই, এতে নেই হাতে-গরম উত্তেজনা। কিন্তু আছে অনেকদিন ধরে একটা কিছু গড়ে তোলার তৃপ্তি, অনেকদিন ধরে একটা নির্দিষ্ট ভাবনা-বৃত্তে নিবিষ্ট হয়ে ঘোরার, একটা মিশনে সপ্রাণ লেগে থাকার তুষ্টি, সমর্থ সন্তানের দিকে তাকিয়ে উদ্যমী মা-বাপের আত্মপ্রসাদ। দায়িত্বকে চুলোর দোরে দিয়ে আমরা দিনের পরে দিন নর্দমায় গড়িয়ে ফেলি বটে, কিন্তু একটা তো মার্কশিট আছে যেখানে নিজেকেই গাঢ় লাল রঙের টকটকে ঢ্যাড়াটা বসাতে হয়। রাতে একলা হেঁটে ফেরার সময় ফিসফিসিয়ে নিজেকে 'ডিসকোয়ালি' 'ডিসকোয়ালি' বলার দণ্ড তো আমাদের মজুত থাকে। সেই অ-মোচনীয় ফেলু-ছাপ্পা বাস্তবে সিন্দুক-বন্দি রেখে আমরা ভার্চুয়াল জগতে আনকোরা অকলুষ আগন্তুক হিসেবে ফের এন্ট্রি নিই। দ্বিতীয় জীবন। বিকল্প সিন। নিজের কাছে নিজে নতুন। দেখি তো এহাত শুধু কাচের গ্লাস স্লিপ খাওয়াতে পারে না কি বীজ থেকে দোমেটে কাণ্ড লতাপাতাসুদ্ধু তুলে দিতে পারে আকাশের দিকে?

অবিশ্যি কহানি মে টুইস্টও আছে। মহত্ত্বে চোনা। সত্যি সত্যি তো আর বাচ্চা খেলতে খেলতে মাথা ফাটাবে না, তাকে পাঁজাকোলা করে হাসপাতালে ছুটতেও হবে না। এ সাপের শিং নেই। এ-খেতে নেই মাজরা পোকার বাস। ভার্চুয়াল কুকুর কাউকে ঘ্যাঁক করে কামড়ায় না, তার লোম থেকে গুমসো গন্ধ বেরোয় না, মুখ দিয়ে ঘিনঘিনে লাল পড়ে না। বেড়াল প্রতিবেশীর দুধে মুখ দেয় না। কাফে-তে সহসা আগুন লেগে যায় না স্টোভ বার্স্ট করে, মস্তান তোলা তুলতে আসে না ব্যবসা ফলাও হচ্ছে বলে। সেবা কী নিট অ্যান্ড ক্লিন! হাতে থ্যাকথ্যাকে পুঁজ লাগবে না, বেডপ্যান বলে কিছু ঘটে না এরাজ্যে। সবচেয়ে বেড়ে মজা: শ্রম কী শৌখিন ও নির্ঘাম! চেয়ারে পেছনটি ঠেকাও ও ডান হাত বারো ডিগ্রি নাড়াও। শীতাতপনিয়ন্ত্রিত ঘরে বসে মৃদু কৃষিকাজ সেরে নাও। এ ধাস্টামিও তুমুল। নিরন্তর লাঙলবাজি করলাম, তালুতে একটি কড়া পড়ল না, পায়ের তলায় আলকুশি কাঁটার বালাই নেই, ঝাঁট দিতে ধরে এল না কনকনে মাজা, ডাব্‌ল ক্লিক করতেই গরু আপনা হতে বাঁট ভাসিয়ে স্ট্রবেরি মিল্ক ঝরঝরাল। বাহবা। একটি বাতহীন, হাঁপানিহীন, দাদহীন, চিমটি চিমটি ময়লাহীন, পোকাচাটা ঘা-হীন, কফ-শ্লেষ্মা-গয়ের-বমি-হলদেহিসি রহিত, নিটোল শ্রম-প্যাকেজ। একটি ডিওডোর‍্যান্টবাচক, ফুরফুরে, শিসধ্বনিপ্রতিম, চোখ-মারা, দায়িত্ব-কাম-কর্তব্য পরিধি। দুপুর নাগাদ দশবার মাউস বুলিয়ে কৃষি বিপ্লব আনি চরাচরে। বিকেল নাগাদ অন্ধ বৃদ্ধকে রাস্তা পার করে দিই। সন্ধে নাগাদ কনুই অবধি ডুবিয়ে জাবনা গুলে ডাবা রেখে আসি গোয়ালের পাশে, বেচারিদের কামড়ে ছিঁড়ে দেওয়া মশাগুলোকে তাড়াতে সাঁজাল দিই। রাত্রে ডোরাকাটা মাছের মুখের গোড়ায় ধরি লিতপিতে কেঁচো। হাঃ, তৎসত্ত্বেও ত্বক নহে টুকুন খড়িওঠা, জানেমন, গোড়ালিতে নেই ন্যূন ধূলি-হুকওয়ার্ম-ফুটকি, আমাদের এই কেয়ার শেয়ার ও কলসি-ওপচানো পেয়ার-এর স্টেডিয়াম একটি সুগোল ওয়াও, টকাস করে মানবিক হয়ে ওঠার এক ফিনাইল-মোড়া ক্র্যাশ কোর্স। প্রেম বিলোব নির্ঘাত, তা বলে কি লেবার ক্লাসের মতো গতর নিক্ষেপ করে? বা, এমনকী সত্যিকারের দুশ্চিন্তায় একটি ভি ফ্রাউন-রেখা ফেলব মাছি-পিছলোনো কলিজায়? বন্ধুকে জিগ্যেস করলাম, হ্যাঁ রে, মাছ যাতে মরে না যায় তার জন্যে যে এত হইহই করছিস, মরে গেলে কী করবি? পিকনিকের রোদ্দুরে পিঠ দিয়ে সে পরম মুখ ভেটকে আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতে বলল, কী আবার? এ তো গন্ধও ছাড়বে না, বিষও ছড়াবে না, মাউসটা ওই মাছের কাছে নিয়ে ডিলিট করে দেব! এগজ্যাক্টলি। ক্ল্যাপ লাগান, বালক-বালিকারা। এই হল শ্রেষ্ঠ নীতিকথা। নয়া দায়িত্ব-ম্যানুয়ালের ফুটনোটে যা দুশোবাহাত্তর পয়েন্টে জ্বলজ্বল করছে। ব্যর্থতা যেখানে একটি ক্লিকে ডিলিটযোগ্য, থুবড়ে পড়া যেখানে টোটাল দায়বিহীন ও রেখে যাবে না এতটুকু ধ্যাবড়া পাপ-ছোপ, পরাজয়কে যেখানে ফেরানো যাবে স্রেফ একটি শ্রাগের ঘাড়ে, সেখানে গোটা সসাগরা গ্রহের ভার এস্কন্ধে ওস্কন্ধে জাগ্‌ল করতে কীসের কুণ্ঠা, কীসের ভয়? বলো, প্রক্সি-জিন্দেগি কি জয়!

না-মানুষের পাঁচালি

বোঝার ভুলে আমরা মানুষকে কষ্ট দিই। একটু চেষ্টা করলে, না-বুঝে আমাদের কাউকে দুঃখ দিতে হত না। আমরা কথা বলতে পারি। তাও ভুল করি, ভুল বুঝি। যারা কথা বলতে পারে না, তারা কী করে বোঝাবে, তারা ভাল থাকার সুযোগ চায় মাত্র! রাগে দিশাহারা হয়ে গালাগাল দিতে গিয়ে আমরা শুয়োরের বাচ্চা বলে সম্বোধন করি। কিন্তু যার ওপরে রোষ, না জেনে তাকে উঁচু আসনে বসানো হল। কারণ শুয়োর সম্বন্ধে আপনি যা জানেন, তা সম্পূর্ণ ভুল। আমরা ভাবি, শুয়োর নোংরা। নোংরার মধ্যে থাকে, অখাদ্য খায় আর আকাট মোটা একটা জানোয়ারের কি বুদ্ধি থাকতে পারে? শুয়োর যারা পোষে, তারা দরিদ্র। তাদের নিজেদের থাকার জায়গাই আঁস্তাকুড়ের সমান। তাই, যাদের ওরা পোষে খাবারের জন্য, রোজগারের জন্য, তাদের সেই আঁস্তাকুড়েই রাখে, নিজেদের সঙ্গেই। তাদের খাবারের কোনও ব্যবস্থা থাকে না। চারপাশের আবর্জনা ঘেঁটে ওরা বাধ্য হয়ে খায়। শুয়োরের নাক বুলডোজারের মতো। আঁস্তাকুড়ের থেকে একটু কম পচা খাবার খোঁজার জন্য তারা নাক দিয়ে ঠেলে ঠেলে আবর্জনা চারদিকে ছড়িয়ে ফেলে। মানুষ বিরক্ত হয়ে বলে, 'কী নোংরা জানোয়ার! ময়লা খায় আর ময়লা ছড়ায়।'

শুয়োরদের বদ্ধ জায়গায় রাখলে, একটা নির্দিষ্ট জায়গায় ওরা ময়লা তো করবেই। সাধারণত ওদের এমন ছোট জায়গায় রাখা হয়, ওরা বাধ্য হয়ে ময়লা করে তার ওপর বসে। বড় জায়গায় রাখলে এক কোণে গিয়ে সবাই ময়লা করবে। পরিষ্কার থাকতে তারা চায়। কিন্তু সে সুযোগ আমরা দিই না। এত স্থূল শরীরে বুদ্ধি থাকতে পারে? শুয়োরদের থাকে। বিজ্ঞানীরা, যাঁরা জানোয়ারদের বুদ্ধি, স্বভাব নিয়ে গবেষণা করেন, তাঁরা বলেন গৃহপালিত পশুদের মধ্যে শুয়োরদের আইকিউ প্রায় শ্রেষ্ঠ। সার্কাসে, টিভিতে আমরা দেখতে পাই, শিক্ষাপ্রাপ্ত শুয়োর গোলকধাঁধার মধ্যে দিয়ে সহজে বেরিয়ে আসতে পারে। আকার চিনতে পারে। চৌকো বা গোলাকার আলাদা আলাদা করে চিনতে তাদের কোনও অসুবিধা হয় না। শুয়োরদের অসম্ভব প্রাণশক্তি। মাটির নীচে যে ব্যাঙের ছাতা হয়, তাকে ট্রুফল বলা হয়। পশ্চিমী আহারে যার মূল্য অনেক। মাটির নীচে ট্রুফল কোথায় আছে, শুয়োররা ঘ্রাণশক্তি দিয়ে বুঝতে পারে। ট্রুফল শুয়োরদের অতি প্রিয়। গন্ধ পেলে জায়গাটা ওরা খুঁড়তে থাকে। শুয়োরের মালিক তখন সেখান থেকে মূল্যবান ট্রুফল বার করে শুয়োরকে পুরস্কার হিসেবে একটু দেয়। বিজ্ঞানীরা তাদের এই ঘ্রাণশক্তি বোমা আর মাদক দ্রব্য বার করার জন্য শীঘ্র ব্যবহার করবেন। আমাদের মতো শুয়োরদেরও অনুভূতি আছে। নিজস্ব ব্যক্তিত্ব আছে। ওরা এক-একজন ব্যক্তি বিশেষ। কিন্তু ওরা ঘৃণ্য। যে নিষ্ঠুর প্রণালীতে ওদের মারা হয়, যে মৃত্যুযন্ত্রণা ওদের সহ্য করতে হয়, তাতে আমাদের কিছু আসে যায় না। আজও কোথাও কোথাও লোহার শিক গরম করে ওদের গুহ্যদ্বারের ভিতর ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। ওদের চিৎকারে অসুবিধা হলে আমরা সরে পড়ি, প্রতিবাদ করি না। পরিবেশ-প্রেমিক সুভাষ দত্ত-র মতো কেউ কি প্রাণিজগতের হয়ে কথা বলবেন, মামলা করবেন?

পশুপ্রেমিক সংস্থাগুলো এখনও পর্যন্ত তেমন কিছু করতে পারেনি। বিদেশেও একই অবস্থা। টেনিসের কিংবদন্তি নাভ্রাতিলোভা বা বিখ্যাত অভিনেত্রী ব্রিজেট বারদো-র মতো লোকেরা পশুদের যন্ত্রণা দেখে নিরামিষাশী হয়ে, পশুদের অধিকার নিয়ে সরব হয়ে কতটুকু করতে পেরেছেন? 'Compassion In Animal Farming' পত্রিকায় পড়েছি শুয়োরদের নাকি চাষ করা হয়। লোহার খাঁচায় গর্ভবতী শুয়োরকে রাখা হয়। ছোট খাঁচায় সে শুধু উঠতে আর বসতে পারে। লোহার শিকের মাঝখান দিয়ে ময়লা পড়ে যায়। শিকের ওপর দাঁড়ানোর আর বসার কষ্ট কি কেউ ভাবে? বাচ্চা প্রসব হলেই বাচ্চাকে সরিয়ে নেওয়া হয়। বাচ্চার নরম মাংসের খুব চাহিদা। মা শুয়োরের মনের কষ্টের কথা কি কেউ ভাবে? তাকে আবার গর্ভবতী করার জন্য প্রস্তুতি চলে। মা-হারা শিশুর কথা ছেড়েই দিলাম।

কিন্তু মাথায়, মনে কী হয়েছে আমাদের? মানুষদের? এত তীর্থ করি, এত গান গাই, শান্তির পিপাসু আমরা এত নিষ্ঠুর?



রো ব বা রে র মে গা

ক্ষমা করো হে প্রভু

রূপক সাহা

জয়দেবের মোবাইলে আসে সুশোভনদার ফোন। একটি প্যাকেট তিনি কুরিয়ার করতে চান গোপনে। কথার শেষে জয়দেব ফিরে আসে তার সীতারাম ঘোষ স্ট্রিটের প্রকাশনা সংস্থায়। পত্রিকার ব্যাপারে আলোচনায় বসে সহকর্মী কৌশিকের সঙ্গে। হঠাৎ হাতে এসে পৌঁছায় সুশোভনদার পাঠানো সেই প্যাকেট।

৪

সারাটা বিকেল আজ খুব ধকল গিয়েছে। তিলজলায় দলিতদের বস্তিতে একটা সমস্যা মেটাতে ওকে নিয়ে গিয়েছিলেন অদ্বৈতবাবু। গরমে গোরা খুব ঘেমেছিল তখন। বার তিনেক গেঞ্জি ভিজে চপচপ করেছে আর শুকিয়েছে। তখনই শরীরটা কেমন যেন করছিল। বাড়ি ফেরার সময় দেখল, গা বেশ গরম। জ্বর আসছে বোধহয়। গাড়ি থেকে অদ্বৈতবাবু রাসবিহারীর মোড়ে নামিয়ে দেওয়ার পর, চেতলা ব্রিজের দিকে হাঁটার সময়, গোরা একবার ভাবল, ওষুধের দোকান থেকে ক্যালপল কিনে নেবে কি না। রাতে জ্বর বাড়লে মুশকিল। কিন্তু পরক্ষণেই ভাবল, ওষুধ কিনে লাভ নেই। ওষুধে ওর জ্বর ছাড়ে না। তার চেয়ে ভাগবত মন্দিরে গিয়ে বসলে, জ্বরটা ছেড়ে যাবে। হ্যাঁ, ও এটা পরীক্ষা করে দেখেছে।

পশ্চিমদিকে হাঁটার সময়ই গোরা শুনতে পেল, ভাগবত মন্দির থেকে সন্ধ্যারতির শব্দ শোনা যাচ্ছে। শহরের ব্যস্তবহুল এই জায়গায় এত সুন্দর একটা মন্দির আছে, আগে ও জানতই না। আধ কিলোমিটারের মধ্যেই কালীঘাটে মায়ের মন্দির। দূরদূরান্ত থেকে লোক আসে। পুজো দিতে সেখানেই যায়। পাণ্ডাদের টানাটানির জন্য তো বটেই, গিজগিজে ওই ভিড়ের কারণেও, কালীঘাটের মন্দিরে গোরার যেতে ইচ্ছে করে না। ওর বাড়ির আরও কাছে এই ভাগবত মন্দির। ওখানে রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহটা ওকে বেশি টানে। সন্ধেবেলায়, আর আরতির পর ওখানে নামসংকীর্তন হয়। বাড়ি ফেরার পথে কোনও কোনওদিন সময় পেলেই গোরা ভাগবত মন্দিরে গিয়ে বসে। খোল-করতালসহ যখন শ্রীহরির নামসংকীর্তন হয়, তখন ওর মনে অদ্ভুত এক ভাবাবেশ হয়। চোখ বুজে ও যেন অন্য কোনও পৃথিবীতে পৌঁছে যায়।

আজ মন্দিরে ঢুকেই গোরা বুঝতে পারল, কোনও পার্বণ আছে। রাধা ও কৃষ্ণের অঙ্গে সোনার অলঙ্কার। রজনীগন্ধা আর বেল ফুলের সিংহাসনে দাঁড়িয়ে আছেন ওঁরা। ফুলের মিষ্টি গন্ধ চারদিকে ম ম করছে। রঙিন কাগজের টুকরো আর গাঁদা ফুলের মালা দিয়ে সমস্ত প্রাঙ্গণটা সাজানো হয়েছে। সারা উঠোন জুড়ে ফরাস পাতা। ঠিক মধ্যিখানে দু'তিনটে চৌকি। সুন্দর কাশ্মীরি কার্পেট দিয়ে ঢেকে দেওয়া। চৌকির ওপর হারমোনিয়াম, তবলা আর বড় একটা সিনথেসাইজার রাখা। বৃন্দাবনের মতো এই মন্দিরে বারো মাসে তেরো পার্বণ লেগেই থাকে। মোহান্তজি গত বছর নিয়ে এসেছিলেন ভজন গায়ক অনুপ জালোটাকে। এত ভিড় হয়েছিল যে, রাসবিহারীর মোড়ে জ্যামজট হয়ে গিয়েছিল। চৌকির ওপর বাদ্যযন্ত্র দেখে গোরা বুঝতে পারল, সম্ভবত আজও নামকরা কেউ গাইতে আসবেন।

'আপনি এখানে? কী আশ্চর্য, সকাল থেকে আপনার কথাই আজ ভাবছিলাম মোহান্ত!'

কথাটা শুনে গোরা পাশ ফিরে তাকাল। মনটাকে বৃন্দাবন থেকে সরিয়ে এনে দেখল, ওর পাশেই দাঁড়িয়ে আছেন ভাগবত মন্দিরের মোহান্তজি। সদ্য স্নান সেরে এসেছেন। কপালে তিলক। পরনে শ্বেতশুভ্র পট্টবস্ত্র। মোহান্তজি প্রসন্ন মুখে তাকিয়ে রয়েছেন। গোরা প্রথম যেদিন এই মন্দিরে ঢুকেছিল, সেদিনই মোহান্তজি নিজে এসে ওর সঙ্গে আলাপ করেছিলেন। ওর পরিচয় জানতে চেয়েছিলেন। সেদিন থেকে উনি গোরাকে মোহান্ত বলে সম্বোধন করেন। কয়েকবার মানা করা সত্ত্বেও মোহান্তজি শোনেননি। নমস্কার করে গোরা বলল, 'আমার কথা ভাবছিলেন কেন মোহান্তজি?'

'আপনার জন্য মনটা আকুলি-বিকুলি করছিল যে! আজ মন্দিরের প্রতিষ্ঠা দিবস। আপনার পায়ের ধুলো না পড়লে, আমাদের সব উদ্যোগই যে ব্যর্থ হয়ে যেত মোহান্ত!'

কথার হেঁয়ালি বুঝতে না পেরে, গোরা বলল, 'এদিক দিয়ে বাড়ি ফিরছিলাম। সন্ধ্যারতির আওয়াজ শুনে ভিতরে ঢুকলাম। সব কুশল তো মোহান্তজি?'

'ঢুকতেই হবে। সব নির্দিষ্ট করা আছে যে!' বলেই থালার ওপর রাখা একটা রজনীগন্ধার মালা তুলে নিয়ে, গোরার গলায় পরিয়ে দিয়ে মোহান্তজি বললেন, 'আপনি কিন্তু চলে যাবেন না। আজ ভজন শোনাতে আসছেন মৃদুলকুমার শাস্ত্রী। বৃন্দাবন থেকে ওঁকে আমরা নিয়ে এসেছি। খুব নামী গায়ক। ওঁর এক-একটা



ভজনের ক্যাসেট, এক-দেড় কোটি কপি বিক্রি হয়।'

বাড়ি ফেরার অবশ্য তাড়া নেই গোরার। শুধু শরীরটা যদি ঠিক থাকে, তা হলে মন্দিরে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিতে ওর কোনও আপত্তি নেই। মৃদুল শাস্ত্রীর নামটা ও জানে। কেননা, ও মৃদুল শাস্ত্রীর ভজন শুনেছে। ওদের জাজপুরের বাড়িতে রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ আছে। খুব ভোরে মা মৃদুল শাস্ত্রীর ভজনের ক্যাসেট চালিয়ে দেন। ক্যাসেট শুধু ওদের বাড়িতে বাজে, তা নয়। জাজপুরের প্রতিটি বৈষ্ণবের বাড়িতে বাজে। বেশ কয়েকটা গানের কলি গোরার মুখস্থ। 'রাধে রাধে জপে চলো, আয়েঙ্গে বিহারী।'...রাধার নাম জপ করো, কৃষ্ণ আসবেনই। গানের সুরগুলো খুব সুন্দর। 'রাধে মেরি চন্দা, চকোর হ্যায় বিহারী', 'রাধা রানি মিছরি, তো সোয়াদ হ্যায় বিহারী'। কলকাতায় এসে পড়াশোনা আর পার্টির চক্করে গোরা এত ব্যস্ত হয়ে গিয়েছে যে, এখন ভজন শোনার সময় পায় না। তবে এখনও গানের লাইনগুলো ও ভোলেনি।

'কী ভাবছেন মোহান্ত?'

প্রশ্নটা শুনে গোরা বলল, 'না, কিছু নয়। আপনার অনুষ্ঠান কখন শুরু মোহান্তজি?'

'ব্যস, আর পাঁচ মিনিটের মধ্যে। হাই কোর্টের একজন জজ গান শুনতে এসেছেন। জাস্টিস রুদ্রপ্রসাদ চ্যাটার্জি। এই মন্দিরের অতিথিশালাটা উনি তৈরি করে দিয়েছেন। এতক্ষণ তাঁর জন্যই আমরা অপেক্ষা করছিলাম। ভক্তরাও বাইরে জড়ো হয়েছেন। আর দেরি করব না। আপনি সামনে গিয়ে বসুন। আমি মৃদুল শাস্ত্রী আর জাস্টিস চ্যাটার্জিকে নিয়ে আসছি।'

মোহান্তজি ভিতরে চলে যাওয়ার পর গোরা দরজার কাছে একটা থামের আড়ালে গিয়ে বসল। উঠে যাওয়ার ইচ্ছে হলে যাতে মোহান্তজির চোখে না পড়ে। বিকেলটা ও কাটিয়েছে তিলজলার এক বস্তিতে। পুতিগন্ধময় এক নরকের মধ্যে। আর এখন ও বসে রয়েছে, ফুলের গন্ধ সুরভিত এক মন্দিরে। মা বলতেন, মানুষের মধ্যেই ভগবান আছে। তা হলে তো বিশ্বাস করতে হয়, একদল ভগবান বসবাস করেন নরকেও! কী অদ্ভুত সেই ভগবানদের সমস্যা। তিলজলায় না গেলে গোরা জানতেও পারত না, এই একবিংশ শতাব্দীতেও এই সমস্যা আছে। আশপাশে ছোটখাটো কারখানার কর্মীরা থাকেন, এমন কিছু দলিত মানুষের একটা বস্তি আছে ওই অঞ্চলে। মূলত, তারা ওড়িয়া ভাষী। ওখানে পানীয় জলের খুব অভাব। এতদিন ওরা পানীয় জল পেত, বস্তির কাছেই সরকারের বসানো এক নলকূপ থেকে। সেই নলকূপের হাতল ভেঙে গিয়েছে। জল পাওয়ার জন্য মরিয়া হয়ে দলিতরা ছুটেছে আধ কিলোমিটার দূরে আরেকটি নলকূপে। কিন্তু সেটি ওদের ব্যবহার করতে দিচ্ছেন না ভদ্রলোকেরা।

এ নিয়ে প্রথমে বচসা, তারপর মারামারি। বস্তির কয়েকটি ছেলেকে ধরে নিয়ে গিয়েছে পুলিশ। স্বভাবতই বস্তির মানুষ উত্তেজিত। অদ্বৈতবাবু ওদের শান্ত করার চেষ্টা করেছেন কয়েকদিন। কিন্তু উনি ওড়িয়া ভাষা ভাল বলতে পারেন না। তাই দুপুরে ইউনিভার্সিটিতে ফোন করে গোরাকে উনি অনুরোধ করেন, 'তুমি তো জাজপুরের ছেলে। ফ্লুয়েন্টলি ওড়িয়া বলতে পার। তুমি আমার সঙ্গে চলো, ওদের বোঝাবে।' অদ্বৈতবাবুর অনুরোধ ফেলতে পারেনি গোরা। তিলজলার বস্তিতে ঘোরার সময় ও দেখে, টিভি চ্যানেলের এক রিপোর্টারও হাজির। ছেলেটা বলছিল, স্বাধীনতার তেষট্টি বছর পরেও সমাজটা বদলাল না। উচ্চবর্ণের লোকেরা দলিতদের টিউবওয়েল ব্যবহার করতে দিচ্ছে না। এটা আমাদের কাছে খবর। গোরা ছেলেটাকে তখন বলে, স্থানীয় কাউন্সিলারের কাছে গিয়ে কেন এই প্রশ্নটা করছেন না? কেন তিনি টিউবওয়েল সারানোর উদ্যোগ নিচ্ছেন না? দলিত বস্তি ওকে ভোট দেয়নি বলে?'

তিলজলা বস্তিতে ওরা যখন লোকের অভাব-অভিযোগের কথা শুনছিল, তখন একটা ওড়িয়া মেয়ে কাঁদতে কাঁদতে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। গোরার হাত ধরে মেয়েটা বলল, পানীয় জল না পেয়ে ওরা কয়েকদিন ধরে পুকুরের জল খাচ্ছে। কাল থেকে ওর বাচ্চা ছেলেটা দাস্ত করে করে মরণাপন্ন অবস্থায় পড়ে আছে। ওকে বেলেঘাটার এক হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ডাগতারবাবুরা ভর্তি নেয়নি। মেয়েটার নামও মনে পড়ল গোরার, মাধবী। ওর কান্নাভেজা মুখটা ভুলতে পারছে না গোরা। পুকুরের দূষিত জল যে ফুটিয়ে খাওয়া উচিত, একথা বোঝানোরও লোক ওখানে নেই। অশিক্ষা, দারিদ্র, উপেক্ষা আর বঞ্চনা রন্ধ্রে রন্ধ্রে। অথচ এই দেশের মোট জনসংখ্যার এক-চতুর্থাংশ দলিত! কী হবে এই দেশের?

'মোহান্তজি, আপনার শরবত।'

তিলজলা বস্তি থেকে মনটা সরিয়ে এনে গোরা দেখল, সুবেশা এক কিশোরী ওর সামনে দাঁড়িয়ে। হাতে ট্রে, তাতে মাটির গ্লাসে সুরভিত শরবত। পনেরো কিলোমিটার দূরে একদল মানুষ পানীয় জলের অভাবে ধুঁকছে, আর অন্য একদল মানুষ ভজন শুনতে শুনতে শরবত পান করছে! ঈশ্বরকে পাওয়ার চিন্তায় তারা বিভোর! গ্লাসটা ও হাতে নিল বটে, কিন্তু বিরক্ত হয়ে ফরাসের ওপর নামিয়ে রাখল। মেয়েটি চোখের আড়ালে যেতেই গোরা উঠে পড়ল। মন্দিরের বাইরে এসে ও টের পেল, জ্বর কমেনি। বাড়ির দিকে হাঁটার সময় বাঁ দিকে ও একটা ওষুধের দোকানে ঢুকল।

চেতলা ব্রিজের কাছে গোরা যে ফ্ল্যাটে থাকে, আসলে সেটা ওর জ্যাঠামশাই ভক্তিভূষণের। রিসার্চ স্কলার। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে উনি অধ্যাপনা করতেন। বৈষ্ণব সমাজ নিয়ে গবেষণালব্ধ ওঁর একটা বই অ্যাকাডেমি পুরস্কারও পেয়েছিল। কলকাতায় থাকার সময় উনি এই ফ্ল্যাটটি কেনেন। অবসর নেওয়ার পর উনি দেশের বাড়ি জাজপুরে চলে যান। দীর্ঘ সময় কলকাতায় থাকার জন্য বাংলার সাহিত্য-সংস্কৃতিকে উনি খুব শ্রদ্ধা করতেন। প্রকাশ্যেই বলতেন, বাঙালিদের কাছ থেকে অনেক কিছু শেখার আছে। উনিই জোর করে গোরাকে কলকাতায় নিয়ে এসে কলেজে ভর্তি করিয়ে দেন।

ফ্ল্যাটে পৌঁছে জামা-প্যান্ট ছেড়ে, পাজামা-পাঞ্জাবি পরে গোরা বিছানায় চিত হয়ে শুয়ে পড়ল। গায়ে কম্বলটা টানার ফাঁকে ও লক্ষ করল, মুকুন্দ তখনও ফেরেনি। ফ্ল্যাটে ওর সঙ্গে থাকে মুকুন্দ নামে দলিত সম্প্রদায়েরই একটা ছেলে। সল্টলেকের এক কলেজে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে। ভুবনেশ্বরে গোরাদের বাড়ির গায়েই মুকুন্দর বাবার ছোট্ট মণিহারি দোকান। মুকুন্দ কলকাতার কলেজে চান্স পাওয়ার পর, উনিই মাকে অনুরোধ করেন, গোরার সঙ্গে যদি ছেলেটা থাকতে পারে। তা হলে হোস্টেলের খরচটা বেঁচে যায়। মা না-করতে পারেনি। পঁচিশ বছর আগেও ওড়িয়া সমাজে কেউ ভাবতে পারতেন না, ভোই সম্প্রদায়ের একটা ছেলে, ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে। কিন্তু এখন দলিত ছেলেমেয়েদের মধ্যেও স্কুল-কলেজে পড়ার আগ্রহ বাড়ছে। বিশেষ করে, শহরাঞ্চলে। গোরা নিজে দলিত আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে চায় বলেই, মায়ের অনুরোধে মুকুন্দকে নিজের কাছে রাখতে রাজি হয়ে গিয়েছিল।

এক বছর ধরে মুকুন্দ এই ফ্ল্যাটে আছে। প্রথম প্রথম ঠিক সময় কলেজ থেকে ফিরে আসত। কিন্তু ইদানীং গোরা লক্ষ করছে, মাঝে মাঝেই দেরি করছে। ওকে নিয়ে চিন্তা হচ্ছে আজকাল গোরার। কেননা, রাতে খেতে বসার সময় দু'একদিন ওর মুখ থেকে মদের গন্ধও পেয়েছে। ধমক দেওয়া সত্ত্বেও মুকুন্দর স্বভাব বদলায়নি। ছেলেটা বদসঙ্গে পড়ে বিগড়ে যাবে, অথচ ও চুপ করে বসে থাকবে, তা হয় না। গোরা ঠিক করে নিল, আজ ফিরলে ছেলেটাকে ভালমতো কড়কে দেবে।

শুয়ে থাকতে থাকতে একটা সময় গোরা টের পেল, গায়ে খুব ঘাম দিচ্ছে। ছোটবেলায় যখন ওর জ্বর হত, তখন মা অনেক সময় বলত, ঘাম হওয়াটা নাকি ভাল লক্ষণ। চোখ বন্ধ করে গোরা মায়ের কথা ভাবতে লাগল। মা অবশ্য আজ ভুবনেশ্বরে



নেই। বাপের বাড়ি রৌরকেল্লাতে গিয়েছে। ফোনে তাই মাকে পাওয়া যাবে না। একদিক থেকে ভালই হয়েছে। জ্বরের কথা শুনলে মা খুব উদ্বিগ্ন হয়ে উঠত। ওকে নিয়ে মা তো একটা সময় কম ভোগেনি! ওর জন্মের আগে থেকেই মা ভুগছে। মামিদের কাছে গোরা শুনেছে, মায়ের পেটে ও আসার পর দশ মাস পেরিয়ে গিয়েছিল। তবুও ও পৃথিবীর আলো দেখেনি। দুশ্চিন্তায় দাদু তখন মাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যান। সোনোগ্রাফি করে দেখা যায়, পেটের ভিতর ও সুস্থভাবেই নড়াচড়া করছে। ডাক্তার অপারেশন করার পরামর্শ দেন। কিন্তু যেদিন সিজারিয়ান ডেলিভারি হওয়ার কথা, সেদিন কোত্থেকে জটাজুট তিন সন্ন্যাসী দাদুর বাড়িতে এসে হাজির। তাঁরা বলেছিলেন, গর্ভের চোদ্দো মাস চলার সময়, এক পূর্ণিমার রাতে প্রসববেদনা উঠবে। ঠিক তাই হয়েছিল।

গোরার মনে পড়ল, ওর জীবনে প্রথম এক সাধুর অলৌকিক কীর্তি দেখেছিল ভুবনেশ্বরে। ওর বয়স তখন আট-ন'বছর। স্কুল থেকে ফিরে হঠাৎ জ্বর। প্রায় দেড়মাস শয্যাশায়ী। গায়ে তাপ এক-এক সময় উঠে যেত চার-এ। ডাক্তাররা অনেক ধরনের পরীক্ষা করেও জ্বর সারাতে পারলেন না। বাড়ির সবাইয়ের ধারণা হয়েছিল, ও আর বাঁচবে না। সেইসময় একদিন খুব ভোরে, সূর্য ওঠার আগে, দু'জন সাধু এসে হাজির। মায়ের কাছে গোরা গল্প শুনেছে, বাড়ির লাগোয়া বাগানে অপেক্ষা করছিলেন সাধুরা। একজন এগিয়ে এসে বললেন, 'তোর ছেলেকে উঠোনে নিয়ে আয়। ডাক্তার বদ্যি ওকে সারিয়ে তুলতে পারবে না। আমরা ওকে ঠিক করে দিচ্ছি।'

মা আর বাবা ওকে উঠোনে এনে শুইয়ে দিয়েছিল। কুয়ো থেকে বালতি করে জল তুলে, দু'জন সাধু ক্রমাগত ওর গায়ে জল ঢালতে শুরু করেছিলেন। একশো বালতি জল ঢালার পর ওঁরা বলেছিলেন, 'যা, তোদের ছেলে ভাল হয়ে গিয়েছে। এবার ঘরে নিয়ে যা।'

বলেই ওই দুই সাধু ভোরের কুয়াশার মধ্যে মিলিয়ে গিয়েছিলেন। আশ্চর্য, সেদিনই গোরার জ্বর সেরে গিয়েছিল। রাতে ও ফের দুই সাধুকে স্বপ্নে দেখতে পেয়েছিল। পাহাড়ের গায়ে একটা গভীর জঙ্গল। পাকদণ্ডী বেয়ে ও ওপরে উঠছে। অনেকক্ষণ পর ও একটা ভগ্ন মন্দির দেখতে পেয়েছিল। বোধহয় দু'তিন হাজার বছরের পুরনো। সেই মন্দিরে ঢোকার সময় গোরা দেখে, দুই সাধু হাতজোড় করে ওর সামনে দাঁড়িয়ে। ওঁরা একটা কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন, 'পরম সাধক ছাড়া এই মন্দিরে কেউ আসতে পারেন না। এই মন্দিরের কথা কাউকে তুই বলবি না। বললে, 'ফের অসুস্থ হয়ে পড়বি। কথাটা মনে থাকে যেন।'

প্রায় দশ-বারো বছর আগেকার কথা। সাধক কথাটার মানে তখন গোরা বুঝতে পারেনি। পরে মাকে জিগ্যেস করেছিল। স্বপ্নের কথা জেনে, মা ওর মুখ চেপে ধরে, সভয়ে বলেছিল, 'থাক বাবা, থাক। একথা তুই আর কাউকে বলিস না। সাধুদের নিয়ে তোর মাথা ঘামাতে হবে না। কাল লিঙ্গরাজ মন্দিরে গিয়ে, তোর নাম করে আমি পুজো দিয়ে আসব।'

সেইসময় সাংসারিক কোনও সমস্যায় পড়লেই মা দৌড়ত ওই লিঙ্গরাজ মন্দিরে। এতদিন কেটে গিয়েছে, তবুও স্বপ্নে দেখা মন্দিরটার কথা হুবহু গোরার মনে আছে। শরীর বিগড়োলেই ওই মন্দিরটা চোখের সামনে ভেসে ওঠে। কেন জানে না, মাঝে মাঝে গোরার মনে হয়, একদিন না একদিন ফের ওই মন্দির থেকে ওর ডাক আসবে। আসবেই।

দরজায় খুট করে শব্দ। মুকুন্দ বোধহয় ফিরল। ওর কাছে একটা ডুপ্লিকেট চাবি থাকে। ঘরে আলো জ্বলে ওঠার পর গোরা দেখল, মুকুন্দই। ওকে শুয়ে থাকতে দেখে, মুকুন্দ বিছানার একটু দূর থেকেই অপরাধী গলায় বলল, 'আপনার কী হয়েছে গোরাভাই?'

উত্তরটা না দিয়ে রুক্ষ মেজাজে গোরা জিগ্যেস করল, 'ক'টা বাজে মুকুন্দ?'

'সিনেমা দেখতে গিয়ে দেরি হয়ে গেল। সরি।'

'তোর বাবা তোকে এখানে সিনেমা দেখতে পাঠিয়েছে, না পড়াশোনা করতে?'

একটু চুপ করে থেকে মুকুন্দ মুখ নিচু করে বলল, 'কলেজের সবাই সিটি সেন্টারে যাচ্ছিল, আমাকে জোর করে নিয়ে গেল। আর কোনওদিন যাব না গোরাদা। আই প্রমিস।'

তিলজলার বস্তির সেই দলিত মেয়েটার মুখ হঠাৎ চোখের সামনে ভেসে উঠল। তার ওপর জ্বরের ঘোর। রাগে গোরা চেঁচিয়ে উঠল, 'কালই জিনিসপত্র নিয়ে তুই বেরিয়ে যাবি। তোকে আর আমি এখানে রাখব না। কথাটা তোর বাবাকে আমি জানিয়ে দিচ্ছি। ভেবেছিলাম, দলিত সমাজের জন্য তুই কিছু করবি। এখন দেখছি, পাঁকেই পড়ে থাকবি। যা, দূর হ, আমাকে আর বিরক্ত করিস না।'

পরের এপিসোড আগামী রোববার
অলংকরণ শান্তনু দে

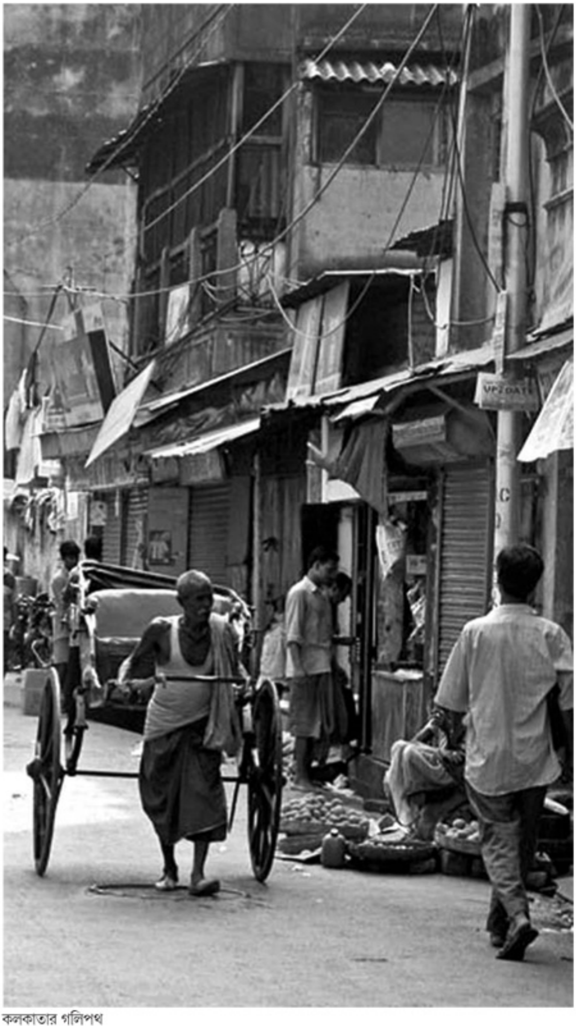


কলকাতার অলিগলির নামরহস্য

মিডলটন রো

এই রাস্তা কলকাতার প্রথম বিশপ টমাস ফ্যানশ' মিডলটনের নামে। মিডলটন যখন কলকাতায় আসেন, ১৮১৪ সালে, তখন শহরে মাত্র দু'টি গির্জা ছিল। মিশন গির্জা ও সেন্ট জন্‌স গির্জা। বৌবাজার অঞ্চলে, যেখানে খ্রিস্টধর্মাবলম্বীদের সংখ্যাধিক্য ছিল, সেখানে মিডলটন গির্জা প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নেন। সাধারণের কাছে পৃষ্ঠপোষকতা চাইলে বৌবাজারের কেরানিবাগানের মালিক রবার্ট ল্যাজেরাস ড'অলিভিয়েরো বাগানটি গির্জা নির্মাণের উদ্দেশ্যে দান করেন। বিশপ মিডলটন সেখানে ১৮২০ সালে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। সর্বসাধারণের জন্য গির্জাটি খুলে দেওয়া হয় ১৮২৩-এর নভেম্বরে। এইটির নাম হয় সেন্ট জেমস গির্জা। কিন্তু কেরানিবাগান তৈরি হয় একটি ৫৫ বিঘার পুকুর বুজিয়ে। এই পুকুরটির নাম ছিল হুজুরিমলের পুকুর, পদ্মপুকুর। পুকুর বোজানো জমি, গির্জা তৈরির সময় ক্রমে বসে যাওয়ায় গির্জাটির চুড়ো তৈরি করা হয়নি, যে কারণে লোকের মুখে মুখে এটির নাম হয়ে যায় ন্যাড়া গির্জা। পরে গির্জার কড়ি-বরগায় উই লেগে ১৮৫৮ সালে গির্জার ছাদ ভেঙে পড়ে। এবার ওই জায়গা থেকে সরে ১৬৪ নম্বর লোয়ার সার্কুলার রোডে জমি কিনে মিডলটন আর একটি গির্জা তৈরি করেন। এই গির্জাটিরও নাম দেওয়া হয় সেন্ট জেমস গির্জা। এর ভিত্তি স্থাপিত হয় ১৮৬২ সালে ও উন্মুক্ত হয় ১৮৬৪-তে। এই নতুন গির্জার মাথায় লাগানো হয় দু'টি চূড়া এবং নাম প্রচলিত হয় জোড়া গির্জা। এটি কলকাতার সবচেয়ে বড় প্রোটেস্ট্যান্ট গির্জা।

সংকলন : ঈপ্সিতা হালদার


কলকাতার গলিপথ



taste elegance
SEAGRAM'S
BLENDERS
PRIDE
MAGICAL NIGHTS
the new look Blenders Pride
Music CDs Experience Seagram's Blenders Pride Magical Nights events.
O&M 112